৭.১৪ মণিষা দ্বীপের গহ্বরে – Bangla Library

৭.১৪ মণিষা দ্বীপের গহ্বরে – Bangla Library

মণিষা দ্বীপের গহ্বরে– ১১৪

আজ মণিষা দ্বীপ বন্যামুক্ত কিন্তু সেখানে দেখা দিয়েছে ভীষণ এক রহস্য যা অতি ভয়ংকর। মিঃ আহাদ চৌধুরীর কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো বনহুর আর রাণী।

রাণীর চোখেমুখেও বিস্ময়, বললো সে–বন্যামুক্ত মণিষায় আবার কি রহস্য ঘনিয়ে এলো যা অতি ভয়ংকর?

বনহুর বললো–চলো বিশ্রামকক্ষে বসে সব শোনা যাবে। তা ছাড়া মিঃ চৌধুরী ক্লান্ত…

হেসে বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী–ক্লান্ত আমি মোটেই নই। তবু চলুন বসে আলাপ আলোচনা করা যাক।

তাই চলো রাণী। বললো বনহুর।

বনহুর মিঃ আহাদ চৌধুরী আর রাণী বিমান বন্দরের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বসলেন।

মিঃ আহাদ চৌধুরী আর রাণীর দৃষ্টি বিনিময় সাধারণ ছিলো না, বনহুরের চোখে তা ধরা পড়ে গিয়েছিলো। অনেক দিন পর মিঃ চৌধুরীকে পাশে পেয়েছে, কোন স্ত্রী না চায় স্বামীর একান্ত সঙ্গ। রাণীও যেমন মিঃ আহাদ চৌধুরীকে পাশে পেতে চায়, তেমনি মিঃ আহাদ চৌধুরীও চান রাণীকে নিবিড় করে কাছে পেতে।

বনহুর একটু হেসে বললো–বিশেষ একটু কাজ আছে, এক্ষুণি ফিরে আসবো। সব কথা শোনা হবে তখন। ততক্ষণে মিঃ চৌধুরী হাতমুখটা ধুয়ে নিন, কেমন?

রাণী বললো, এসো। কিন্তু তাড়াতাড়ি।

মিঃ চৌধুরী বুঝতে পারলেন বনহুরের মনের কথা, তিনি সিগারেট কেসটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

ততক্ষণে বনহুর বেরিয়ে গেছে।

মিঃ আহাদ রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন–জানো রাণী, ও কেন চলে গেলো?

জরুরি কাজে।

মোটেই না।

তবে?

কতদিন পর মিলন মোদের বৃথা যেন নাহি যায়……কথা শেষ না করে রাণীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলেন মিঃ চৌধুরী।

রাণীর সুন্দর মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, বললো–সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছো। বিয়ের পর কতদিন তোমার পাশে ছিলাম বধূবেশে, সবই

ভুলে গেছো বুঝি? বলো, মা কেমন আছেন?

ভালো।

অন্যান্য সবাই?

তবুও

সবার খোঁজখবর রাখা আমার ডিউটি নয়।

যতটুকু জানি মঙ্গলময়ের দোয়ায় মঙ্গলে আছে। তবে মায়ের ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে একবার দেশের বাড়িতে যাই। আমার ইচ্ছাও কি কম, সেই যে... কতদিন আগে বধূবেশে এসেছিলে মায়ের পাশে, তারপর আর যাওনি। মাকে কত বলেকয়ে শান্ত রেখেছি.....

সত্যি?

হাঁ সত্যি, বলেছি বিদেশ গেছে পড়াশোনার ব্যাপারে।

এত বড় মিথ্যে বলতে পারলে তুমি?

উপায় ছিলো না, জানোত মার বড় আদরের বধূ তুমি, মানে একমাত্র সন্তানের....

. বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

মিঃ আহাদ রাণীর হাত ধরে টেনে নিলেন গভীর আবেগে। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন তিনি রাণী ওষ্ঠদ্বয়। স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললেন–মা বলেছিলেন স্বামী সোহাগিনী হও কিন্তু

তুমি আমাকে ধরাই দাও না...।

কতদিন পর মিঃ আহাদ চৌধুরী আর দস্যুরাণী মিলিত হলো, কথাবার্তায় মেতে উঠলো ওরা।

বললো রাণী–কতদিন তোমার মাকে দেখি না।

আমার মাকি তোমার মা নয়?

ক্ষমা করো, তোমার মা আমার মা। সত্যি তার সেই সৌম্যসুন্দর মুর্তি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। তার স্নেহ মমতা আমাকে করেছিলো অভিভূত তাই তো আমি রাজি হয়েছিলাম এ বিয়েতে...

নইলে?

বিয়ে করতাম না, কারণ কেউ আমাকে বন্ধনে আবদ্ধ করুক তা আমি চাইনি।

কিন্তু আমি তো তোমাকে বেঁধে ফেলেছিলাম......কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই মিঃ চৌধুরী বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেন রাণীকে।

আঃ ছাড়ো, ও এসে পড়বে!

না, আসবে না, জানো কতদিন পর তোমাকে আমি পাশে পেয়েছি। কত কথা জমা হয়ে আছে আমাদের দুজনের মধ্যে।

এখন জমানো কথা শোনার বা বলার সময় নেই আহ্লাদ। সত্যি মাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তবুও মনটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছি। জানো আহাদ, বনহুর কিন্তু বড় মহৎ....ওর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

মিঃ আহাদ অভিমানের সুরে বললেন–শেষ পর্যন্ত রাণী না হারিয়ে যায় বনহুরের মধ্যে। কথাটা বলে মিছেমিছি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

রাণী মিঃ আহাদের চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বললো–ভয় নেই, তোমার রাণী কোনোদিন হারিয়ে যাবে না। তোমার রাণী তোমারই থাকবে।

সত্যি সত্যি তো?

সত্যি আহাদ, তোমার আমার ভালবাসা এক বিস্ময়। একদিন তুমি আমাকে গ্রেফতারের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলে কিন্তু আমি আড়াল থেকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করে গেছি, কারণ আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

হাঁ রাণী, সত্যি আমাদের ভালবাসা বিস্ময়ই বটে, কারণ তুমি দস্যুরাণী আর আমি গোয়েন্দা মানে ডিটেকটিভ। আজও মনে পড়ে বঙ্গোপসাগরে আমি নিক্ষিপ্ত হলাম আর তুমি বোবা তরুণের বেশে লাইফবয় নিয়ে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে সাগরবক্ষে। তুমি যদি লাইফবয় নিয়ে সাগরবক্ষে না পড়তে তাহলে আমার সলিল সমাধি হয়ে যেতো। সত্যি সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও মনটা আমার আনন্দে ভরে ওঠে।

রাণী আহাদের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে–আমার কিন্তু খুব রাগ হয়।

কারণ?

তখন তুমি বড় বেখেয়াল ছিলে। সর্বক্ষণ দূর থেকে তোমাকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিলো। পুলিশবাহিনী থাকতো তোমার সঙ্গে, সাধ্য ছিলো না তোমার পাশে যাই।

মিঃ আহাদ বলে উঠলেন–বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রাণী এগিয়ে গেলো।

হ্যালো মিঃ আলম এসে পড়েছেন তাহলে? বনহুরকে রাণী মিঃ আলম বলে প্রকাশ্যে ডাকতো, অবশ্য এ নাম বনহুর নিজেই ব্যবহার করার জন্য বলেছিলো রাণীকে।

রাণীকে দীপ্তমুখে দেখে বললো বনহুর–আমার যে কাজ বাকি ছিলো সমাধা করে এলাম। মিঃ চৌধুরী হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মিঃ আহাদ রাণীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবার বললেন–ব্যস্ত না হলেও উদ্বিগ্ন ছিলাম।

কারণ?

আপনাকে বিশ্বাস করাটা অত্যন্ত শক্তপ্রাণ মানুষের কাজ।

আপনি কি বলতে চান পালিয়ে বাঁচলাম?

না, ততখানি হাল্কাও নই। জানতাম আসবেন কিন্তু কখন যে আসেন তাই ভাবছিলাম। আসুন এবার নিভৃতে আলাপ আলোচনা করা যাক।

মণিষা দ্বীপের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় বসলো বনহুর, মিঃ আহাদ চৌধুরী আর রাণী।

টেবিলের মাঝামাঝি এ্যাসট্রে।

রাণী ছাড়া দুজনের হাতে সিগারেট।

সিগারেট হতে রাশি ছড়িয়ে পড়ছে কক্ষময়। গম্ভীর হয়ে পড়েছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

বনহুর সিগারেট পান করার ফাঁকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিটা তুলে ধরছিলো আহাদ চৌধুরীর মুখের দিকে। তার মুখমন্ডল কিছু পূর্বে যেমন সচ্ছ লাগছিলো এ মুহূর্তে তা নেই। একটা ভাবগম্ভীর ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার মুখখানাকে।

বনহুর অর্ধদগ্ধ সিগারেটখানা এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে রেখে বললো–মণিষা দ্বীপ নিয়ে কিছু বলবেন বলেছিলেন। কি যেন রহস্য....

হাঁ, রাণী যখন ইটালীর ভয়াবহ ভূমিকম্প নিয়ে ভাবছিলো তখন মণিষা দ্বীপের ভয়ংকর বন্যার সংবাদ আমাকে বিচলিত করে তুললল। এমন ভয়াবহ বন্যা নাকি মণিষা দ্বীপে কোনোদিন হয়নি। দীর্ঘ তিন হতে চার ঘন্টা মণিষা দ্বীপ গভীর জলোচ্ছাসে নিমগ্ন ছিলো।

এমন বন্যা কোনোদিন কোথায় হয়নি শুনেছি। পাহাড়ের মত উঁচু জলোচ্ছাস নাকি সমস্ত দ্বীপটাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনি যখন মণিষা দ্বীপে পৌঁছলেন তখন কি অবস্থা দেখলেন সেখানে? বনহুর প্রশ্ন করে তীক্ষ্ণদৃষ্টি তুলে ধরলো মিঃ আহাদের মুখের দিকে।

মিঃ চৌধুরী একবার রাণীর মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর দৃষ্টিস্থির করলেন তিনি বনহুরের মুখের দিকে। বললেন– দেখলাম তা বর্ণনাতীত। জাহাজ মণিষা দ্বীপে নোঙ্গর করতেই আমরা জাহাজ থেকে দেখলাম দ্বীপের বিভিন্ন গাছগাছড়ার ডালে আটকে রয়েছে শাড়ি জামা আর লুঙ্গীর টুকরো। অনেক

মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে রয়েছে গাছের ডালের ফাঁকে। সেকি মর্মান্তিক দৃশ্য। কণ্ঠস্বর ধরে এলো মিঃ চৌধুরীর।

রাণী বললো–শুনেছি বাংলাদেশের কোন্ এক স্থানে এই ধরনের হারিকেন ঝড় সহ প্লাবন হয়ে গেছে।

বনহুর বললো–রাণী দেখছি বাংলাদেশের সব সংবাদও রাখেন।

আর মিঃ আলম বুঝি একেবারে অজ্ঞ। তিনি যে সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ রাখেন……কথাটা বলে হাসলেন মিঃ চৌধুরী।

মিঃ আহাদ চৌধুরী বনহুরকে পাকড়াও করবেন বলে একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা চষে ফিরেছেন। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ যেমন মিঃ আহাদ চৌধুরী, তেমন দুর্দান্ত দুঃসাহসী দস্যু বনহুর–কেউ কম না।

মিঃ আহাদ যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠছেন তখন বনহুর আড়ালে থেকে হাসছিলো, কারণ বনহুর জানতো বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য ডিটেকটিভ আহাদ চৌধুরীকে সুদূর রায়হান হতে কান্দাই আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে এসেছেন আরও কয়েকজন তার সহকারী বন্ধু এবং বিশেষ সহকারী সমীর কুমারও এসেছেন। তখন বনহুর সুন্দরভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে মিশে গিয়েছিলো পুলিশমহলে এবং পুলিশ মহলেই শুধু নয়, একেবারে পুলিশ প্রধান হিসেবে সে মিঃ আহাদের সঙ্গী বনে গিয়েছিলো।

অবশ্য পুলিশ প্রধান এসেছিলেন বিদেশ থেকে, তাই বনহুরের কাছে পুলিশ প্রধানের বেশ আরও সহজ হয়েছিলো। আসল পুলিশ প্রধানকে সরিয়ে নিতে তখন আর বেগ পেতে হয়নি।

বিমান বন্দরে অবতরণের পূর্বেই তাকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে বনহুর নিজে সেখানে পুলিশ প্রধানের ভূমিকা পালন করেছিলো।

কান্দাই পুলিশবাহিনী একটুও বুঝতে পারেনি যে এই ব্যক্তি আসল পুলিশ প্রধান নন। পুলিশমহল সবাই অভিনন্দন জানালেন বিমান বন্দরে। এমন কি মিঃ আহাদ চৌধুরীও বনহুরের করমর্দন করে তাকে স্বাগতম জানালেন।

ওদিকে পুলিশপ্রধানকে কৌশলে বন্দী করে তাঁকে বনহুরের শহরের আস্তানার একটি সুন্দর কক্ষে আটক করে রাখা হয়েছিলো।

বিদেশী পুলিশপ্রধানের চেহারার সঙ্গে পরিচয় ছিলো না কান্দাই প্রশাসন বিভাগের, কাজেই কারো অসুবিধা হয়নি সেদিন।

কিন্তু মিঃ আহাদ চৌধুরীও কম নন, তিনি কদিনের মধ্যেই বনহুরকে নিজের পাশে আবিষ্কার করলেন। তবে তিনি হুট করে তাকে গ্রেপ্তার না করে তাকে আরও ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করেন, কারণ বনহুরকে তিনি না দেখলেও তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলেন এবং সেইমত ধারণাও ছিলো।

ইচ্ছা করলে মিঃ আহাদ চৌধুরী বনহুরকে অনায়াসে সেদিন গ্রেপ্তার করতে পারতেন, এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে পাঁচলক্ষ টাকা পুরষ্কার পাবেন তাও জানতেন। তবুও মিঃ আহাদ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বনহুরকে ভালভাবে লক্ষ্য করছিলেন–লক্ষ্য করছিলেন তার কার্যকলাপ চালচলন কথাবার্তা এবং ব্যবহার।

অবশ্য বনহুরও যে বুঝতে পারেনি তা নয়। মিঃ আহাদ চৌধুরী যে তাকে চিনে ফেলেছেন তা সে বেশ অনুভব করে। তাই বলে পালিয়ে যায় না। বরং মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করে।

একদিন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো বনহুর।

পাশে ছিলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

বনহুরের দৃষ্টি বাইরে থাকলেও মন ছিলো তার গাড়ির ভিতরে মিঃ চৌধুরীর দিকে।

মিঃ চৌধুরী লক্ষ্য করছিলেন বনহুরকে।

হেসে বললো বনহুর–মিঃ চৌধুরী আপনার এবং আমার মধ্যে মিথ্যা অভিনয় সত্যি হাস্যকর, কারণ আপনার পরিচয় আমার কাছে অজানা নয়, আমার সম্বন্ধেও আপনি নিশ্চিন্ত......

মিঃ আহাদের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিলো সেদিন। বনহুর সম্পূর্ণ পুলিশপ্রধানের ড্রেসে রয়েছে এবং প্রশাসন বিভাগ তাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে

চলেছে। শুধু তাই নয়, যখন যেভাবে সাহায্যের দরকার সেইভাবে সহযোগিতা করে চলেছে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী ভেবেছিলেন তিনি বনহুরকে চিনতে পারলেও বনহুর তা জানে না। আজ বনহুর যখন বললো যে আমরা উভয়ের সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করে চলেছি তখন ভীষণ আশ্চর্য, হয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী। কথাটা শুনে বনহুরকে তিনি চিনেও গ্রেপ্তার করেননি, তা ছাড়াও বনহুর বিষয়টা জানে তাও তিনি মনে করেননি। অথচ এ মুহূর্তে বনহুর যা বললো তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি বনহুরকে চিনতে না পারা ভান করলেও বনহুর ঠিকই ধরে ফেলেছে......ওকে না দেখা পর্যন্ত ওর সম্বন্ধে নানা ধরনের কথা কানে এসেছে, নানা ধরনের কল্পনার জাল মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে, তারপর বনহুরকে যখন স্বচক্ষে দেখলেন এবং তার সঙ্গে মেলামেশা করলেন তখন বনহুরের আসল রূপ প্রকাশ পেলো মিঃ আহাদ চৌধুরীর কাছে। তারপর বনহুর গাড়ি চালাতে চালাতেই হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করেছিলো বন্ধুত্ব কায়েম করার জন্য।

সেই বন্ধুত্ব আজও কায়েম আছে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ আর বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুরের মধ্যে।

ইচ্ছা করলে মিঃ চৌধুরী বনহুরকে পাকড়াও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ অর্থের লালসা মিঃ চৌধুরীর ছিলো না। বনহুরকে চিনতে পেরেও তিনি তাকে যাচাই করে দেখছিলেন লোকমুখে যা শোনেন তার কতখানি সত্য আর কতখানি মিথ্যা

চৌধুরী বনহুরের মহত্ত্বে এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকলাপে অভিভূত হয়েছিলেন সেদিন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তার কানে নানা ধরনের অশ্লীল উক্তি প্রবেশ করেছিলো।

সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গিয়েছিলো, দস্যু হলেও সে একজন মহৎ হৃদয় মানুষ। এই পরিচয়টাই বেশি করে তার মনকে বিমুগ্ধ করেছিলো। সত্যি মিঃ চৌধুরী বনহুরকে বন্ধুরূপে পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করেছিলো।

তার মনে একটা ভয়ংকর দ্বিধাদ্বন্দ ছিলো বনহুরকে নিয়ে। তিনি এখন দ্বিধাদ্বন্দু মুক্ত, কারণ, বনহুরের আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে তার কাছে।

মিঃ চৌধুরী সিগারেটটা এস্যাসট্রেতে খুঁজে রেখে বললেন–মণিষা দ্বীপ বন্যামুক্ত হলেও বিপদমুক্ত হয়নি, কারণ বিস্ময়কর এক জীব সাগর হতে আবির্ভাব হয় এবং জীবটি তার নিশ্বাসের দ্বারা সম্মুখস্থ জীবজন্তু যে কোনো প্রাণীকে পায় টেনে নেয়। একেই মণিষা দ্বীপবাসী ভীষণ অবস্থার শিকার, তারপর এই ভয়াবহ জীবটা দ্বীপবাসিগণকে বিপন্ন করে তুলছে......

জীবটা কি আপনি দেখেছেন? বললো বনহুর।

রাণীও বনহুরের কথায় যোগ দিয়ে বললো–জীবটাকে তুমি দেখেছো আহাদ?

মিঃ চৌধুরী বললেন–শুধু দেখিনি যুদ্ধও করেছি ওর সঙ্গে বন্দুক হতে শুরু করে তীরধনু পর্যন্ত। জাহাজে রাইফেল পিস্তল এবং বন্দুকের বেশি তেমন কোনো শক্তিশালী অস্ত্রে কাবু হয়নি।

মোটেই না। অদ্ভুত এ জীব। কতকটা হাতীর শুড়ের মত তার চেহারা কিন্তু আকারে হাতীর শুড়ের একশত ভাগ মোটা। জীবটা সাগরগর্ভে যখন ভেসে ওঠে তখন সাগরের পানিতে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়। তখন দ্বীপবাসী ভীত আতঙ্কিত হয়ে যে যত দূরে সরে যাবার জন্য প্রাণপণে ছুটতে থাকে। কে কোন দিকে ছুটছে না দেখলে ঠিক বোঝানো যাবে না।

তারপর কি ঘটে? বললো রাণী।

মিঃ আহাদ বললেন–ছুটেও রেহাই পায় না তারা প্রচন্ড ঝড়ের বেগে একটা হাওয়া ছুটে আসে সেই বৃহৎ আকার হস্তী গুড়ের ভিতর হতে, পরক্ষণেই যা কিছু থাকে সব সেই প্রচন্ড হাওয়া টেনে নিয়ে যায় সাগরবক্ষে হস্তীওঁড়ের গহ্বরে। অনেকে গাছপালা আঁকড়ে ধরেও নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু বাঁচতে পারে না। সেই গাছপালা সহ উপড়ে চলে যায় হস্তীশুড়ের গহ্বরে। ভীষণ এ দৃশ্য......

বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলো। এবার বললো–মণিষা দ্বীপবাসী কি পূর্বে এ ধরনের জলজীবের সন্ধান দিতে পেরেছে।

না। তারা কোনোদিন এ ধরনের জলজীবের সন্ধান পায়নি বা জানে না। এই ভীষণ বন্যার পর হতে হঠাৎ এই ধরনের জীবের আবির্ভাব এই প্রথম।

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো, তার মুখমন্ডলে একটা চিন্তার ছাপ পরিলক্ষিত হলো।

রাণীর সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা এড়ালো না।

বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হলো রাণী।

জলজীবটা কি হতে পারে এ বিষয় নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চললো। কিন্তু এমন কোনো জীবের সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরীর মনে কিছু উদয় হলো না।

বনহুর আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সোজা হয়ে বসলো।

মিঃ চৌধুরী বললেন–মণিষা দ্বীপবাসীদের কি ভাবে এই ভয়ংকর জলজীবের কবল থেকে রক্ষা করা যায়?

রাণী বললো–নিশ্চয়ই এটা গভীর সাগরতল থেকে উঠে এসেছে। হয়তো অক্টোপাশ জাতীয় জীব হবে।

বনহুর একমুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো–এ ধরনের একটি জীবের কবলে আমি একবার পড়েছিলাম।

একসঙ্গে চমকে উঠলো রাণী এবং মিঃ আহাদ চৌধুরী।

মিঃ চৌধুরী বললেন–এ ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার।

হাঁ দরকার বটে, কারণ এমন কিছু বৈজ্ঞানিক মেশিনাদির দরকার যা জীবটাকে হত্যা করার ব্যাপারে প্রয়োজন হতে পারে।

*

জাহাজের ডেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন আহাদ চৌধুরী এবং বনহুর। উভয়ের হাতে রয়েছে বাইনোকুলার, সামনে নানা ধরনের মেশিনাদি। দিকদর্শন যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। রাণী।

চন্দনাও এসেছে রাণীর সঙ্গে। রাণীকে সে ছেড়ে দিতে রাজি নয়, যদিও তার প্রিয় স্বামী আহাদ চৌধুরী সঙ্গে রয়েছে।

চন্দনা বললো–রাণী, দূরে সরু একটা রেখার মত কিছু দেখা যাচ্ছে।

রাণী চন্দনার হাত হতে বাইনোকুলার হাতে নিয়ে চোখে লাগিয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলো, আমরা মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি এসে গেছি।

রাণী এবং চন্দনার কথা শুনলো বনহুর ও মিঃ আহাদ। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে রাণী আর চন্দনার মতই আনন্দ ধ্বনি করে বললেন–আহাদ চৌধুরী মিঃ আলম, আমরা ঠিক মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

বনহুর আর মিঃ আহাদ যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান হতে মাত্র কয়েক হাত দূরে রাণী। এবং চন্দনা তাদের কাজে ব্যস্ত ছিলো।

রাণী এবং চন্দনা শুনতে পাচ্ছিলো মিঃ আহাদ এবং বনহুরের কথাবার্তা। সমুদ্রের গর্জন তেমন ছিলো না বলেই তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো। রাণী বললো–জাহাজ মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি না নিয়ে কমপক্ষে কয়েক শমাইল দূরে রাখা দরকার। জীবটা যখন ভেসে উঠবে তখন যেন আমাদের জাহাজের কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

চন্দনা বললো–রাণী, ঠিক বলেছো কিন্তু জীবটা যখন এত ভয়ংকর তখন আমাদের। জাহাজখানাকে ভেঙে খান খান করে ফেলতে পারে....

মিঃ চৌধুরী বলে উঠলেন–সে কথা মিথ্যা নয়, জীবটা জাহাজখানাকেও তার উদরের গহবরে টেনে নিতে পারে।

বনহুর বললো–কাজেই আমাদের আর এগুনো সমীচীন নয়।

বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী– আমরা আর সামান্য কিছু এগুবো তারপর.....

কথা শেষ হয় না মিঃ আহাদ চৌধুরীর, হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠে জাহাজখানা।

জাহাজের সবাই গড়িয়ে পড়ে এদিকে ওদিকে। ভারী মেশিনগুলো উল্টে পড়লো একপাশে।

রাণী ও চন্দনাও গড়িয়ে পড়লো।

মিঃ চৌধুরীকে ধরে ফেললো বনহুর, নইলে তিনি রেলিংয়ের উপরে পড়ে আহত হতেন।

সবাই বুঝতে পারলে তাদের জাহাজের তলদেশে বিরাট কিছু আটকে পড়েছে। এটাও তারা বুঝতে পারলো কোনো বস্তু তাদের জাহাজের তলদেশে আবির্ভাব হয়েছে।

মিঃ চৌধুরীর মুখমন্ডল আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি বলে উঠলেন–মিঃ আলম, আমি যা ভেবেছিলাম তাই……মণিষা দ্বীপের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই আবির্ভাব ঘটলো ওর।

হাঁ জীবটাই হবে।

রাণী আর চন্দনা ততক্ষণে উঠে পড়েছে এবং মিঃ আহাদও বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বললো রাণী–জাহাজটাকে ক্যাপ্টেন সামলে নিয়েছে। গলায় ঝোলানো মাইক্রোফোনে সে ক্যাপ্টেনকে সাবধানে জাহাজ পিছিয়ে নেবার জন্য নির্দেশ দিতে লাগলো।

ওদিকে জাহাজখানাকে কেউ যেন জাহাজের তলদেশ থেকে উল্টে ফেলার চেষ্টা করছে। বিরাট ভারবাহী জাহাজ বলেই উল্টে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ ভেসে আসছে সাউন্ডবক্সে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে জাহাজখানাকে উল্টে যাওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে কিন্তু পিছানো সম্ভব হচ্ছে না, কারণ যে জিনিসটা আমাদের জাহাজখানাকে উল্টে ফেলার চেষ্টা করেছিলো সেটা এখন আমাদের জাহাজের পেছন অংশের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে।

বললো রাণী–তবু জাহাজখানা এই স্থান হতে কিছু দূরে সরিয়ে নিতে হবে। নাহলে যে কোনো মুহূর্তে জাহাজখানা উড়ে যেতে পারে।

বনহুর আর মিঃ আহাদ বুঝলেন তাদের জাহাজখানা এখন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন। জাহাজখানা ও জাহাজে যারা আছে এবং জাহাজের মূল্যবান মেশিনাদি সব সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

বনহুর বললো–মিঃ চৌধুরী, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি দেখছি...... বনহুর নিজে ভয়াবহ মেশিন বা একটি কামানের চেয়েও ভয়ংকর সেই মেশিনের কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাণীও এলো তার পাশে, কারণ এ মেশিন চালনায় রাণী নিজেও দক্ষ ছিলো।

মিঃ চৌধুরী জাহাজের সারেঙ্গ এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন মাইক্রোফোনের সাহায্যে। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছিলো ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে এবং জাহাজের ইঞ্জিনকক্ষের সাউন্ডবক্সে।

হঠাৎ প্রকান্ড একটা হস্তীশুড় মাথা তুললো জাহাজ থেকে কয়েক গজ দূরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড একটা ঝড়। ঝড় নয় সাইক্লোন।

জাহাজটার যা কিছু হাল্কা জিনিসপত্র ছিলো সব হাওয়ার বেগে উড়ে যেতে লাগলো।

মিঃ চৌধুরী এবং রাণী চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে একটি ক্যাবিনের শার্শির ফাঁকে দেখতে লাগলো। সেকি অদ্ভুত জীব। ঠিক হস্তীশুড়ের আকার বটে কিন্তু তার অগ্রভাগে প্রকান্ড একটি ছিদ্রপথ। ছিদ্রপথটির আকার একটি সুড়ঙ্গপথের চেয়ে কম নয়।

বনহুর মেশিনটার মুখ সেই বিস্ময়কর জীবটার দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে কিন্তু ভীষণ ঝড়ের বেগে বনহুর স্থির থাকতে পারছিলো না। তার দেহটা বুঝি এই মুহূর্তে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে।

মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছানোর পূর্বেই তারা এমনভাবে সেই জীবটার কবলে পড়বে ভাবতে পারেনি। বনহুর অতিকষ্টে মেশিনটার মুখ হস্তীশুড় জীবটার দিকে ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হলো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মেশিনগানটি।

হস্তীশুড় জীবটাকে স্পর্শ করলো কিনা সন্দেহ, কারণ হস্তীশুড় জীবটা একটু নড়লো না। বরং বিরাট মাথাটা আরও উঁচু করলো।

এখন জাহাজখানা থেকে অনেক দূরে মনে হচ্ছে জীবটাকে। আসলে জীবটার গোটা দেহ কেমন কেউ জানে না।

এখনও জীবটার সম্পূর্ণ দেহটা কেউ দেখেনি বা দেখার সুযোগ ঘটেনি। সমুদ্র তলদেশে কত গভীরে তার দেহের শেষ অংশ রয়েছে তাও বোঝা যায় না।

জীবটা ধীরে ধীরে ঐ মুহূর্তে তলিয়ে গেলো।

অবশ্য বনহুর আরও বেশ কয়েকটা গোলা মেশিনগান থেকে খুঁড়তে সক্ষম হয়েছিলো।

মেশিনগানের গোলা হস্তীশুড় জীবটাকে কতখানি কাহিল করেছে ঠিক বোঝা গেলো না।

জীবটা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতেই মিঃ আহাদ ও রাণী ছুটে এলো তার পাশে।

চন্দনা এবং অন্যান্য অনুচরগণও এসে ভীড় জমালো।

রাণী বনহুরের সাথে করমর্দন করে বললো–সত্যি তুমি অসাধারণ। এমন বিপদের মধ্যেও তুমি একটুও ঘাবড়ে যাওনি।

মিঃ চৌধুরী জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে বুকে। অত্যধিক আবেগে ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

সবাই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো, এবার বসে পড়লো একটা টেবিলের চারপাশে মিঃ চৌধুরী রাণী চন্দনা আর আহাদ চৌধুরী। কিছুক্ষণ নানা ধরনের আলোচনা চললো।

সেদিনের মত বেঁচে গেলেও তারা নিশ্চিত নয়। কারণ আবার কোন সময় কি ঘটে। এ সব। ব্যাপারে আলোচনা চললো।

*

ক্রমে রাত্রি নেমে এলো।

সাগরবক্ষ শান্ত। তবে প্রচন্ড ঢেউগুলো আপনমনে জাহাজের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে খেলা করছিলো।

জাহাজখানা যেখানে ছিলো সেখানেই রাখা হলো। এগুনো বা পিছানো সমীচীন মনে করলো না তারা। কারণ কোন্ সময় আবার কোন্ বিপদ আসবে কে জানে। দিনের আলোতে তারা এগুবেন এটাই ঠিক করা হলো।

সবাই ক্লান্ত তবু কারও চোখে ঘুম নেই।

এমন কি ক্যাপ্টেন নিজেও তার ক্যাবিনে বসে চোখে দুরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। না জানি কোন মুহূর্তে জীবটা আবার মাথা তুলবে কে জানে।

ক্যাপ্টেন মিঃ ক্যারিলন দুঃসাহসিক বটে, জাহাজ নিয়ে তাকে বহু সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। কিন্তু এমন ধরনের জীব কোনো দিন তার নজরে পড়েনি বা এমন জীবের পাল্লায় পড়েননি।

সরকারের নির্দেশ তাঁকে জাহাজ হিমাংসু নিয়ে মিঃ চৌধুরিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। জাহাজ হিমাংসুর অভ্যন্তরে রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। কামান গোলা বারুদ মেশিনগান আর যত রকম অস্ত্রযুদ্ধের প্রয়োজন হয় সব আছে এ জাহাজে, এমন কি বিমানধ্বংসী কামানও রয়েছে এ জাহাজে। হাল্কা জাহাজ হলেও হস্তীশুড় জলজীবটার প্রচন্ড নিঃশ্বাসে জাহাজখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো। আর যদি না ক্যাপ্টেন এবং সারেঙ্গ সুদক্ষ হতো।

ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের চালকগণ ও রাণীর বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনায় জাহাজখানা রক্ষা পেয়েছে। তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার জীবটা যদি হালকা চালায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

ক্যাপ্টেন ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

তিনি এমন জীব সম্বন্ধে ধারণাও করেননি। যদিও তিনি জানতেন সাগরতলে নানা ধরনের জীব বসবাস করে থাকে কিন্তু এমন জীব সম্বন্ধে তাঁর জানা নেই।

ক্যাপ্টেন উদ্বিগ্নভাবে ক্যাবিনের শার্শী দিয়ে চারদিকে লক্ষ্য করছিলেন।

রাণী মিঃ আহাদ এবং বনহুর তারাও লক্ষ্য করছিলো। ভোর হলে জাহাজ মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি নিয়ে যাবেন।

রাত গভীর।

সমুদ্রের গর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে প্রচন্ড ঢেউগুলো আঘাত হানছে জাহাজখানার শরীরে।

আকাশ মেঘমুক্ত।

অসংখ্য তারার মালা আকাশের বুকে বুটিলোলা গালিচার মত মনে হচ্ছিলো।

আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর। দৃষ্টি তার সীমাহীন জলরাশির দিকে।

মিঃ আহাদ এবং রাণী কফি পান করার জন্য ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে।

এবার সমীর কুমার অসুস্থ থাকার জন্য মিঃ চৌধুরীর সঙ্গী হতে পারেনি। বেচারী মিঃ চৌধুরীর শুধু সঙ্গীই নয়, তার বন্ধুও বটে। সমীর না থাকায় আহাদ চৌধুরীর খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো যতই হোক সে তার সহচর।

কফি পান করছিলো রাণী আর মিঃ আহাদ।

বনহুরকেও তারা ডেকেছিলেন কফি পান করার জন্য কিন্তু বনহুর যায়নি, বলেছিলো আপনারা পান করে আসুন, আমি পাহারা দেই।

চন্দনাও ছিলো।

সেই–কফি পরিবেশ করছিল।

মিঃ আহাদ চৌধুরী আর রাণীকে কফি দিয়ে সে এক কাপ কফি নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

রাণী আর আহাদ মৃদু হাসলো।

বললেন আহাদ চৌধুরী–চন্দনা শেষ পর্যন্ত না বনহুরের মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সে ভাবনা তোমার করতে হবে না।

মানে আমার বন্ধুবর সমীর তো চন্দনাকে ভালবাসে,

কিন্তু চন্দনা কি তাকে ভালবাসে?

তা আমি অবশ্য জানি না, কারণ তোমাদের মনের কথা বোঝা মুস্কিল।

আর তোমাদের মনের কথা বুঝি বড় সরল, না বললেও বেশ বোঝা যায়।

তবু আছি কিছুটা কিন্তু.....

যাক আর শুনতে চাই না। তোমার সেই হস্তীশুড় হিংস্র জীবটা জীবনে রেহাই দেবে কিনা কে জানে।

*

কে?

আমি।

চন্দনা?

হাঁ, কফি এনেছি।

কার জন্য?

আপনার।

কেনো কষ্ট করতে গেলে চন্দনা?

সত্যি আপনার জন্য বড় কষ্ট হয়।

আমার জন্য?

হা। আপনাকে বড় একা মনে হয়।

দাও। হাত বাড়িয়ে বনহুর চন্দনার হাত থেকে কফির কাপটা নেয়।

তারাভরা আকাশ।

হাল্কা আলোর ছটায় ঝাপসা লাগছে সব।

গরম কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলে বনহুর–বেশ ঠান্ডা বোধ হচ্ছে।

তবু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে......

মন্দ লাগছে না।

এমন একটা ভীষণ আর ভয়ংকর জীব নিয়ে এখন আমরা উদ্বিগ্ন অথচ আপনি বলছেন বেশ। লাগছে।

এসব ব্যাপার গা সওয়া হয়ে গেছে।

আপনি দেখছি রাণীর মত কথা বলছেন। ওর কথায় একটুও গলা কাপে না, একটুও সে ঘাবড়ে যায় না যত বিপদই আসুক না কেন।

তোমার রাণী জানে মৃত্যু একবারই ঘটবে কাজেই কোনো ব্যাপারে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তা ছাড়া বিপদ আসবেই, পদে পদে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কি জানি আপনাদের সকলের কথাই যেন এক ধরনের। মিঃ চৌধুরীও তাই বলেন রাণীর কথাও ঠিক একই রকমের। সত্যি আপনারা যেন এক বৃন্তে তিটি ফুল।

বনহুর হাসলো–তাই নাকি?

আচ্ছা মিঃ আলম আপনার কথা অনেক শুনেছি! রাণীর মুখেও শুনেছি।

জানি সবাই আমাকে ঘৃণা করে, এই তো?

না, তার উল্টো।

ও সব কথার দাম নেই......তা ছাড়া আমাকে নিয়ে কে কি বললো শোনবার সময়টাই বা কোথায়?

সত্যি আপনি বিস্ময়!

মোটেই না, একজন মানুষ–রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ।

কিন্তু আপনি মানুষ হলেও অসাধারণ।

তার মানে?

আজ কতদিন ধরে আপনাকে দেখছি। যত দেখছি ততই অবাক হয়েছি......

অবাক হবার কারণ?

থাক আজ নয়।

বনহুর কফির খালি কাপটা ফিরিয়ে দিলো চন্দনার হাতে।

চন্দনা খালি কাপটা হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো, ফিরে দাঁড়িয়ে বললো– সাবধানে থাকবেন।

আধো অন্ধকারে বনহুর মৃদু হাসলো।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট মুখে গুঁজে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো।

হিমেল হাওয়া বইছে।

সমুদ্রের প্রচন্ড ঢেউগুলোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর সিগারেট পান করে চললো আর ভাবতে লাগলো জীবটা যদি নাগালের মধ্যে ভেসে ওঠে তাহলে যেমন করে হোক কাবু করতে সক্ষম সে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ জাহাজখানা দুলে উঠলো।

চমকে উঠলো বনহুর।

মিঃ আহাদ এবং রাণী দ্রুত বেরিয়ে এলো।

ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেলো–সাবধান জীবটা পুনরায় জাহাজের আশেপাশে কোথাও এসে গেছে।

বনহুর বলে উঠলো–সার্চলাইটটা জাহাজটার চারপাশে সমুদ্রের বুকে তীব্র আলো ছড়িয়ে ঘোঘারাতে বলুন। আমি বিমানধ্বংসী কামানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রাণী বললো–আমি দ্বিতীয় কামানে যাচ্ছি। বনহুর, তুমি লক্ষ্য ঠিক করে কামান চালাবে।

আমি ঠিক আছি তবে কামানের গোলা তার দেহের চামড়া ভেদ করলে হয়। বললো বনহুর।

মিঃ চৌধুরী বলে উঠলেন–বিপদ যখন এসেছে তখন তার সঙ্গে সমানভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ও রাণী তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

কথা শেষ হয় না মিঃ চৌধুরীর, জাহাজের অনতিদূরে পর্বতের মত একটা কিছু দেখা যায়।

চীৎকার করে বনহুর বলে সার্চলাইটের আলো নিভিয়ে দিন এবং গোটা জাহাজটাকে অন্ধকার করে ফেলুন……

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা অন্ধকার হয়ে গেলে সার্চলাইট নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

গর্জে উঠলো বনহুরের কামান।

পরপর আগুনের গোলা বেরিয়ে যাচ্ছে বনহুরের বিমানধ্বংসী কামান থেকে।

রাণীও তার কামানের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মিঃ চৌধুরী সাহায্য করছেন রাণীকে।

রাণীর কামান থেকেও অগ্নিগোলা নির্গত হতে শুরু হলো।

পর্বতের মত জমাট অন্ধকার জীবটার দেহে অগ্নি–গোলাগুলী বিদ্ধা না হলেও আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ছে সাগরবক্ষে।

এবার বনহুর সার্চলাইটের আলো জীবটার ওপর ফেলতে বললো। কারণ এতক্ষণ প্রচন্ড ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছিলো। তারা সবাই বুঝতে পেরেছে যে জীবটার নিঃশ্বাসের এ ঝড়। হঠাৎ ঝড়ের বেগ কমে যাওয়ায়, বনহুর বুঝতে পারলো জীবটা নেতিয়ে পড়েছে। কামানের আঘাত তার চামড়া ভেদ না করলেও দেহটা থেতলে দিয়েছে, তা ছাড়া অগ্নিগোলা জীবটার নাসিকা গহ্বরেও দুচারটে প্রবেশ করেছে।

সার্চলাইট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখলো কালো পর্বতের মত জীবটা সাগরবক্ষে কাৎ হয়ে পড়েছে। মাথাটা তোলার চেষ্টা করছে সে বার বার। কেমন যেন উল্টে যাচ্ছে জীবটার মাথাটা।

বনহুর হর্ষধ্বনি করে বললো–মিঃ চৌধুরী, আমরা জয়যুক্ত হয়েছি! করমর্দন করলো সে মিঃ চৌধুরী এবং রাণীর সংগে।

ততক্ষণে পূর্বদিক আলোকিত করে রবির উঁকি মারছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আলোতে আলোকময় হয়ে উঠলো।

সবাই ভালভাবে লক্ষ্য করছে জীবটাকে।

যদিও জীবটার সমস্ত অংশ পানির তলায়, তবু যতটুকু দেখা যাচ্ছে তা পাহাড়ের চেয়ে কম নয়। বিরাট মাথার কিছু অংশ আর কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছিলো। জীবটা মৃত্যুবরণ করেছে বলে মনে হলেও আসলে তখনও কিছুটা জীবন আছে বলে মনে হচ্ছে!

জীবটার বিশাল দেহ ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে মনে হলো।

ক্যাপ্টেন ক্যামেরাম্যানকে জীবটার অর্ধমৃত ছবি নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

ক্যামেরাম্যান এবং বনহুর বোট নামিয়ে জীবটার দিকে এগুলো। অবশ্য মিঃ চৌধুরীও যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু বোট ছোট্ট থাকায় দুজনে সেই বোটে উঠলেন।

এক সময় জীবটা সত্যি সত্যি সাগরের তলদেশে তলিয়ে গেলো।

মিঃ আলম, ক্যামেরাম্যান এবং মিঃ চৌধুরী, রাণী উচ্ছল আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

আনন্দে দীপ্ত সবার মুখ।

জয়ের উল্লাসে উল্লাসিত ওরা সবাই।

জাহাজ নিয়ে তখন তারা মণিষা দ্বীপে যাওয়া উচিত মনে করলো, কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে চায় মণিষাবাসিগণ কেমন অবস্থায় আছে।

একদিন একরাত কেটে গেলো।

মণিষা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জাহাজখানা। তখন হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো নীল সাগর দিয়ে একটা জাহাজ দ্রুত উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে।

রাণী বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো জাহাজখানা যাত্রীবাহী না মালবাহী। জলদস্যুদেরও হতে পারে।

জলদস্যুরা এ সব অঞ্চলে শিকারের আশায় প্রায়ই আনাগোনা করে থাকে। মিঃ আহাদ চৌধুরীও বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছেন।

বনহুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে দেখছিলো।

তার মুখোভাব গম্ভীর হয়ে উঠলো।

রাণী বলে উঠলো জাহাজের গতি মন্থর অথচ আমাদের জাহাজখানা তারা লক্ষ্য করেও এদিকে এগুলো না। আমার সন্দেহ হচ্ছে জাহাজখানা সাধারণ যাত্রীবাহী নয়।

বনহুর বললো–হা রাণী, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। জাহাজখানা নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছে অথচ তবু বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

মিঃ চৌধুরী বললেন–গতি পূর্বের চেয়ে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যেন আমরা তাদের জাহাজখানাকে ফলো করে তাদের জাহাজ আটক করতে না পারি। হয়তো রাতের কামানের শব্দ ঐ জাহাজের যাত্রীদের কানেও পৌঁছেছিলো। কারণ গভীর রাতে কামানের আওয়াজ…

বললো বনহুর–তাও আবার সাগরবুকে ভীত হবার কারণ রয়েছে বৈকি। কিন্তু যাই বলুন জাহাজটা সম্বন্ধে আমার মনে বেশ খটকা লাগছে।

হাঁ, জাহাজখানা দ্রুত আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেনকে বলে দাও রাণী, ঐ জাহাজখানাকে পাকড়াও করতেই হবে। আমরা জানতে চাই ঐ জাহাজখানা কাদের–বললেন আহাদ চৌধুরী।

বললো বনহুর–আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ চৌধুরী, জাহাজখানার গতিবিধি কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

রাণী সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলো, যে জাহাজখানা দূরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার চেষ্টা করছে ঐ জাহাজখানাকে যেমন করে তোক ধরতে হবে।

ক্যাপ্টেন রাণীর কথামত জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিলেন। পেছনে পড়ে রইলো সেই পর্বত সমান মৃত জলজীবটার প্রাণহীন দেহ। বিমানধ্বংসী কামানের গোলা ছাড়া জীবটাকে হত্যা করা কোনো মতেই সম্ভব হতো না। যদিও জীবটা তলিয়ে গেছে তবু সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়নি। ডুবন্ত পর্বতের মত কিছুটা অংশ তখনও জলরাশির উপরিভাগে দেখা যাচ্ছিলো।

রাণী আর মিঃ চৌধুরী দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে জীবটাকে শেষ বারের মত দেখতে লাগলো।

বনহুর বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে আছে দূরে বহুদূরে জাহাজখানার দিকে। জাহাজখানার গতিবিধি সন্দেহজনক তাছাড়া জাহাজটার আকার স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের।

স্পীডে এগুতে লাগলো রাণীর জাহাজ।

আগ্নেয়াস্ত্রগুলো প্রস্তুত করে রাখা হলো।

ঐ জাহাজখানা যদি জলদস্যুদের হয় তাহলে মোকাবেলা করতে হবে।

সবাই ডেকে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ঐ জাহাজখানাকে লক্ষ্য করছিলো।

ক্যাপ্টেন তার ক্যাবিন থেকে বললেন–জাহাজটার মধ্যে একটি বিরাট আকার খাঁচা নজরে আসছে।

বনহুর বললো– হাঁ, এ রকমই মনে হচ্ছে।

জাহাজখানা যত দূরে সরে যাচ্ছিলো এ জাহাজখানা ততই স্পীডে এগুচ্ছিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লো রাণীর জাহাজখানা। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাহাজের উপরিভাগ।

বনহুর ওদিক লক্ষ্য করছিলো।

চীৎকার করে বললেন ক্যাপ্টেন–কয়েকটি খাঁচা আছে জাহাজটার খোলসের মধ্যে একটি খাঁচার মধ্যে একটি লোককে আটক করে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে……..

বললেন মিঃ চৌধুরী–হাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি জাহাজখানার ডেকে যে খাঁচা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি বাঘ আটক করে রাখা হয়েছে। নিচে খোলসের মধ্যের খাঁচাগুলোতে কিছু জীবজন্তু আটক করে রাখা হয়েছে। তার সঙ্গে অপর এক খাঁচায় একটি লোককে আটক করে রাখা হয়েছে।

বনহুর একটু থেমে পুনরায় বললো–রাণী, এ জাহাজখানা সেই জাহাজ যারা তোমাকে আর চন্দনাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলো।

রাণীর চোখে বাইনোকুলার।

বললো সে–হাঁ, এই সেই ইংরেজ শিকারীদলের জাহাজ। বনহুর, তুমি যদি সেদিন ঐ মুহূর্তে আমাদের উভয়কে উদ্ধার করতে সক্ষম না হতে তাহলে ঐ খাঁচায় আমাদের বন্দী অবস্থায় হিংস্র জীবগুলোর মতই আটক থাকতে হতো।

মিঃ আহাদ চৌধুরী ঘটনাটা শুনেছিলেন, তাই তিনি বললেন–ও, এই জাহাজখানাই তাহলে সেই জাহাজ?

হা মিঃ চৌধুরী! বললো চন্দনা।

বনহুর বললো–খাঁচায় বন্দী লোকটা কে? কাকে ওরা বন্দী করে নিয়ে চলেছে?

মিঃ চৌধুরী বললো–এক সময় ইংরেজ বণিকগণ দাস ব্যবসা করতো। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে নিরীহ মানুষদের ধরে নিয়ে যেতো এবং তাদের নিজেদের বশ্যতা শিকার করাতে, তারপর ইচ্ছামত দেশ বিদেশে চালান দিতে বিক্রির জন্য।

হাঁ, এ কথা জানি এবং কত ভয়ংকর সেই রুটস কাহিনী। না জানি আরও কতজন বন্দী আছে ঐ জাহাজের খোলের মধ্যে। বনহুর কথাগুলো বলে বিমানধ্বংসী কামানগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

মিঃ চৌধুরী হেসে বললেন–আবার যুদ্ধ নাকি?

হয়তো হতে পারে। বললো–বনহুর।

রাণী বললো–যেমন করে হোক ওদের বন্দী করবোই। সে রাগ আমার এখনও এতটুকু কমেনি……দাতে দাঁত পিষে বললো।

সামনের জাহাজখানা বুঝতে পেরেছে ঐ জাহাজটি তাদের জাহাজখানাকে পাকড়াও করবে বলে দ্রুত আসছে। জাহাজখানার লোকজনকে ইংরেজ বলে মনে হচ্ছে। দুচারজন নিগ্রোও আছে ওদের মধ্যে।

প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে জাহাজ দুটি।

একটি জাহাজ পালানোর জন্য ছুটছে।

অপরটি ধাওয়া করে চলেছে।

ওরা রাণীর জাহাজে বিমানধ্বংসী কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেয়েছে, কাজেই ভীত হয়ে পড়েছে ওরা। অবশ্য ওদের জাহাজেও রয়েছে নানা ধরনের অস্ত্রপাতি। ঘড়ঘড়ি, বাঘ ধরার ফাঁদ এবং নানা রকমের জীবজন্তু পাকড়াও করার সরঞ্জাম।

বাইনোকুলারে মিঃ চৌধুরী এবং অন্যান্য সবাই স্পষ্ট দেখছিলেন এখন বাইনোকুলার ছাড়াই সব নজরে পড়েছে।

বনহুরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে সেই খাঁচার দিকে নিবদ্ধ হলো। যে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে একটি লোককে।

মিঃ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–দেখুন একটি লোককে খাঁচায় হাত পা মুখ বেঁধে রাখা হয়েছে।

হাঁ। ঠিক বলেছেন মিঃ আলম...।

কথা শেষ হতে না হতেই ঐ জাহাজ থেকে রাইফেল গর্জে উঠলো। ওরা আকাশের দিকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে গুলী ছুড়ছিলো।

চন্দনা বললো–খাঁচার লোকটি যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। পাশেই ছিলো বনহুর, তার মুখের দিকে তাকাতেই চন্দনা লক্ষ্য করলো বনহুরের মুখমন্ডল ভীষণ গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

রাণীও নিকটেই ছিলো, তার মুখটাও যেন ভাবগম্ভীর লাগছে। তার হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে।

বললো রাণী—-ঐ জাহাজে কেউ অস্ত্র নিয়োগ করোনা। তারপর বনহুরকে বললো–তুমি মাইক দিয়ে দ্বিতীয় জাহাজটিকে বলো আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে। নইলে আমরা কামান থেকে গোলা ছুড়বো।

বনহুর মাইকে মুখ লাগিয়ে বলতে লাগলো।

বনহুর ইংরেজি ভাষায় বলছিলো কারণ ঐ জাহাজখানায় যারা ছিলো সবাই ইংরেজ কয়েকজন নিগ্রো ছাড়া।

মাইক থেকে শব্দ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো।

বলছে বনহুর–আমরা আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করবো না ক্ষতি সাধন করবো যদি না তোমরা জাহাজখানাকে থামাও। বারবার বনহুর তার বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত কথা গুলো বলে চললো।

কিন্তু জাহাজখানা শুনেও না শোনার ভান করলো, গতি আরও বাড়িয়ে দিলো। জাহাজখানা এগিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী বললেন–তোমরা জাহাজের গতি মন্থর করো, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না।

অগত্যা কামান থেকে সাগরবক্ষে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলো বনহুর।

পরপর কামান গর্জে উঠতে লাগলো।

তবু সামনের জাহাজ পূর্বের চেয়ে আরও গতি বাড়িয়ে এগুতে লাগলো।

রাণী বলল–ওরা গতি মন্থর করবে না। ওরা আমাদের শত্রু সেটা বুঝতে পেরেছে।

বনহুর নিজে এবার কামানের সামনে এসে দাঁড়ালো একটু হেসে বললো–ওদের জাহাজকে এক্ষুণি আমি সলিল সমাধিতে পরিণত করতাম কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝতে পেরেছে এটা সেই জাহাজ যে জাহাজ বন্য জীবজন্তু ধরবার জন্য জম্বুর পর্বতে গিয়েছিলো, ভেবেছিলো নিচে সাগর উপরে পর্বতমালা–বন্য জীবজন্তু শিকারের ব্যাপারটা সহজ হবে। আরও অনুমান করতে পেরেছে ওদের খাঁচায় বন্দী তরুণটি ইন্দ্রনাথ……

চমকে উঠলেন মিঃ আহাদ–আপনি চেনেন ওকে?

বললো বনহুর–চিনি।

রাণী বললো–সে অনেক কথা। পরে সব শুনতে পারবে।

বনহুর কামানের মুখ জাহাজখানার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো–যদি বলো রাণী তাহলে জাহাজখানাকে উড়িয়ে দেই।

না, তা হয় না। যেমন করে হোক ইন্দ্রনাথকে বাঁচাতে হবে। কি করে তাকে ইংরেজগণ বন্দী করেছে ভেবে পাচ্ছি না।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে কামান থেকে সামনের জাহাজ লক্ষ্য করে অবশ্য নিচের অংশে গোলা নিক্ষেপ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানার পেছন অংশ খন্ড খন্ড হয়ে উড়ে গেলো।

রাণী বলে উঠলো–একি করলে বনহুর?

বনহুর মিঃ আহাদকে বললো–আপনি এদিকে সামলে নিন আমি ঐ জাহাজে যাচ্ছি যদি ফিরে না আসি ঘাবড়ে যাবেন না। ওকে বাঁচাতেই হবে...

কথা কয়টি বনহুর বলে সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আহাদ চৌধুরী কোনো কথা বলার সময় পেলে না।

সামনের জাহাজ দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে।

রাণীও লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো কিন্তু চন্দনা আর মিঃ চৌধুরী বাধা দিলেন, কারণ ঐ জাহাজখানায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

রাণী বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছে বনহুর কোথায় ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

চন্দনার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন বারবার জাহাজ পিছিয়ে নেওয়ার জন্য সারেঙ্গকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

মুহূর্তে কি ভীষণ কাণ্ডই না ঘটে গেলো।

ইংরেজদের তীব্র আর্তনাদ।

জংলী জীবজন্তুর প্রাণফাটা হুংকার। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ভয়াবহ লেলিহান তীব্র। চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন তবু রাণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারবার মনে পড়ছে বনহুরের শেষ কথা, যদি ফিরে না আসি ঘাবড়ে যাবেন না ওকে বাঁচাতেই হবে......

মিঃ চৌধুরী রাণীর হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন–তুমি বুঝতে পারছে না ঐ জাহাজের বিস্ফোরণ এ জাহাজটাকেও গ্রাস করে ফেলতে

পারে.......

তবু ভয় পাই না। বেচারা বনহুর.....

*

প্রচন্ড ঢেউ ঠেলে জ্বলন্ত জাহাজটার দিকে এগিয়ে চলেছে বনহুর। একটা লাইফবয় সে সম্বল করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

দাউ দাউ করছে অগ্নিশিখা আর ভয়ংকর গর্জন।

বনহুর লাইফবয়টা নিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত এগুতে লাগলো। জঙ্গলের রাজা বনহুর–সব সময় সে বন জঙ্গল নদ–নদী সাগর সমুদ্র নিয়ে কাটিয়েছে। যত হিংস্র জীবজন্তুই হোক বনহুর ভয় পায় না এবং যত নদ–নদী সাগর সমুদ্র হোক সে পরোয়া করে না। বনহুর প্রচন্ড ঢেউ ঠেলে অর্ধডুবন্ত জাহাজখানার দিকে এগুতে লাগলো। যেমন করে হোক জাভেদকে বাঁচাতেই হবে।

চেষ্টা ব্যর্থ হলো না।

অতিকষ্টে সে অধজলমগ্ন জ্বলন্ত জাহাজখানার নিকটে পৌঁছে গেলো।

সেকি ভয়ংকর দৃশ্য!

সমস্ত জাহাজখানা তখন জ্বলছে।

হিংস্র জীবজন্তুগুলোর খাঁচায় আগুন ধরে গেছে। জন্তুগুলো জ্বলন্ত আগুনের অসহ্য তাপ সহ্য করতে না পেরে সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কতকগুলো পুড়ে অংগারে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজদের তো কথাই নেই, তারা ঠক ঠক করছে। কতকগুলো ইংরেজ লাইফবয় নিয়ে আঁপিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। নিগ্রোগুলোর অবস্থাও তাই। কাউকে নিশ্চুপ দেখা যাচ্ছে না। সবাই প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এত তাড়াতাড়ি এ ভাবে জাহাজখানা জ্বলে উঠবে ভাবতে পারেনি কেউ।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখছে জাভেদকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। কাজেই জাভেদ সাঁতার জানলেও তার মৃত্যু অবধারিত।

মরিয়া হয়ে উঠেছে বনহুর।

বিরাট বিরাট ঢেউগুলো অতিক্রম করে এক সময় জাহাজখানার অতি নিকটে পৌঁছে গেলো। সেই দিকে তখন অগ্নিশিখা গ্রাস করেনি। বনহুর উঠে পড়লো তার জীবনরক্ষী লাইফবয়টা নিয়ে।

হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর। চারদিকে আগুন জ্বলছে। পাশেই খাঁচার কিছু অংশে আগুন ধরে গেছে। বনহুর একদন্ড বিলম্ব না করে খাঁচায় প্রবেশ করে এবং জাভেদকে তুলে নেয় কাঁধে। জাভেদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মৃত্যুর প্রহরণ গুণছিলোহাত পা তার বাঁধা এমন কি মুখটাও কালো কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

বনহুর যদি ঐ মুহূর্তে তাকে খাঁচা থেকে বের করে আনতে সক্ষম না হতো তা হলে জাভেদের দেহটা দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাভেদ মৃতের মত হয়ে পড়েছিলো, কারণ কদিন তাকে কিছু দেওয়া হয়নি তার পেটের নাড়ীভুড়ি হজম হবার যোগাড়। বেশ দূর্বল হয়ে পড়েছিলো জাভেদ।

বনহুর অতিকষ্টে জাভেদকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো খাঁচার ভেতর থেকে। কতকগুলো অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহগুলো ডিংগিয়ে পার হয়ে এলো।

কয়েকজন ইংরেজ যারা জীবিত আছে তারা প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটাছুটি করছে। কোনদিকে তাদের খেয়াল নেই। হিংস্র জীবজন্তুগুলোও লাফালাফি করছে এদিক থেকে সেদিক। কতকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রাণরক্ষার জন্য সাগরবক্ষে।

বনহুর প্রায় সংজ্ঞাহীন জাভেদকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। চারদিক হু হু করে আগুন জ্বলছে। তীব্র আর্তনাদ আর অগ্নিশিখার লেলিহান শিখা।

বনহুর যেখানে লাইফবয়টা ঝুলিয়ে রেখে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো সেটা ঠিক সেখানেই রয়েছে। জাভেদকে ডান হাতে কাঁধে ভালভাবে ধরে রেখে লাইফবয়টা নিয়ে সমুদ্রগর্ভে লাফিয়ে পড়লো বনহুর।

ওদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে সমস্ত জাহাজখানা।

*

অনেক কষ্টে লাইফবয়সহ এক সময় এসে পৌঁছে গেলো বনহুর। সংজ্ঞাহীন জাভেদকে কোনো মতেই ছাড়েনি। কাঁধে পিঠে বহন করে নিয়ে এসেছে সে তীরে।

কি করে যে বনহুর সেই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ভীষণ আর প্রচন্ড ঢেউ ঠেলে তীরে এসে পৌঁছতে সক্ষম হলো সে নিজেই ভেবে পাচ্ছে না।

সাগর আর তার তীর, কতদূর ছিলো সে জানতো না। জানতে না পাবে কিনা সে মাটির ছোঁয়া। বিস্ময়কর পরিস্থিতি অতিক্রম করে ভাগ্যের জোরে একসময় তীরে এসে পৌঁছে গেলো।

জাভেদের সংজ্ঞাহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো বনহুর। হাত পা এবং মুখ বাঁধা, বালির উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বনহুর তাকিয়ে দেখছে কিন্তু তার শরীর এত বেশি ক্লান্ত অবশ হয়ে পড়েছিলো যে ঐ মুহূর্তে নড়বার শক্তি তার ছিলো না।

তবুও সান্ত্বনা, জাভেদকে রক্ষা করতে পেরেছে। কি করে সম্ভব হলো ভাবতেই শিউরে না। উঠলেও বিস্ময় জাগছে, হয়তো তার কাজ এখনও শেষ হয়নি, তাই হয়তো খোদাতালা এ যাত্রা তাকে রক্ষা করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর নিজকে সুস্থ মনে করলো।

সে এগিয়ে গেলো জাভেদের কাছে। মাথাটা তুলে নিলো কোলের ওপর। হাত বুলিয়ে চুলগুলো ঠিক করে দিলো যত্ন সহকারে। কিন্তু হাত আর পা শিকল দিয়ে বাঁধা ছিলো তাই সে খুলে দিতে পারছিলো না। মুখের কালো রুমালখানা খুলে দিয়েছে। এখন জাভেদের নিঃশ্বাস ঠিকমত প্রবাহিত হচ্ছে। হয়তো বা অল্পক্ষণেই সংজ্ঞা ফিরে আসবে তার।

কিন্তু জাভেদ তাকে চিনতে পারবে না।

জানতে পারবে না কে সে।

পূর্বের রাগ যদি তার জাভেদের মধ্যে এখনও থেকে থাকে তাহলে সে সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর হয়তো ভীষণ ক্ষেপে উঠতে পারে। হয়তো বা সে ক্ষীপ্তের মত

সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে পারে……

বনহুরের চিন্তাধারা শেষ হয় না, সে তাকাতেই দেখতে পেলো জাভেদ পাশ ফিরবার চেষ্টা করছে। ভীষণ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

এবার সে দেখতে পেলো বনহুরকে।

একটা হিংসভাব ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে। অতিকষ্টে উঠে বসলো, তাকালো সে বনহুরের দিকে। ঠোঁট দুখানা কামড়ে ধরলো তারপর তাকালো নিজের শিকলে আবদ্ধ হাত ও পাদুখানার দিকে।

বনহুর বললো–তোমাকে ইংরেজগণ বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলো। জাহাজসহ আগুনে সব পুড়ে মরেছে শুধু তুমি বেঁচে আছে।

কোনো জবাব দিলো না জাভেদ।

বনহুর বললো–ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি তোমায় কাঁধে করে…… লাইফবয়টা দেখিয়ে বললো–ঐ ওটার সাহায্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি। নইলে আগুনে পুড়ে তুমিও সলিল সমাধি বরণ করতে……

তবুও জাভেদ কোনো কথা বললো না, শুধু স্থিরচোখে নিজের হাতের এবং পায়ের শৃংঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো কেমন করে এই নির্জন ভয়ংকর স্থান হতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কি করে জাভেদকে তার পূর্বের স্মৃতিশক্তিতে ফিরিয়ে আনা যায়। কেমন করে ওর হাত পা শৃংখাবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করা যায়।

জাভেদ বারকয়েক শিকলটার ওপরে হাত বুলিয়ে দেখে নিলো, তারপর ভীষণ জোরে হাতে মোচড় দিলো। বনহুর অবাক হয়ে গেলো জাভেদ হাতে মোচড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিকলের তালাটা খুলে গেলো। শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুখানা মুক্তি লাভ করলো।

উঠে দাঁড়াতে গেলো জাভেদ কিন্তু পারলো না। তার পা সে মুক্ত করতে সক্ষম হলো না।

জাভেদ বসে পড়লো বালুকারাশির উপর।

পায়ে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছে তবু সে রাগে গস্ গস্ করছিলো। বনহুরকে সে যেন সহ্যই করতে পারছে না। বনহুর বললো–জাভেদ, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি কে বলতে পারবে?

জাভেদ নীরব।

সে কোনো জবাব দিচ্ছে না।

জবাব না দিলেও তার চোখমুখ দেখে বনহুর বেশ অনুধাবন করলো জাভেদ তাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না।

বনহুর চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। সমুদ্রতীরে সীমাহীন বালুকারাশি, সমুঘগর্ভে অথৈই পানি। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ আর উচ্ছ্বাস গর্জন ছাড়া আর কিছু কর্ণগোচর হচ্ছে না। অনেক দূরে ঘন জঙ্গল অথবা কোনো গ্রাম বা শহর হবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর জাভেদকে রেখে যাবে এ ভরসাও পাচ্ছে না, কারণ তার পা দুখানা বন্ধন অবস্থায় রয়েছে।

এবার বনহুর একটি পাথর হাতে নিয়ে আর একটি মাঝারি পাথর দিয়ে জাভেদের পায়ের শিকল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

জাভেদ যে হাতের শিকল মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেললো এতে বনহুর নিজেও আশ্চর্য কম হয়নি। মনে মনে সে যে খুব খুশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর যখন জাভেদের পায়ের বন্ধন মুক্ত করার চেষ্টা করছিলো তখন সে নিশ্চুপ ছিলো।

বুদ্ধিমান বনহুর বালুকারাশির মধ্য হতে পাথর দুটো খুঁজে নিয়ে বারবার চেষ্টা করে এক সময় খুলে ফেললো জাভেদের পায়ের শিকল।

বন্ধনমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো, দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে গেলো জাভেদকে কিন্তু জাভেদ বনহুরের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে

সরে বসলো।

জাভেদের মুখ দেখে মনে হয় না সে খুশি হয়েছে। কেমন যেন মুখটা গম্ভীর হয়ে পড়েছে তার যদিও ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর লাগছে তাকে তবুও তার রাগ কমেনি একটুও।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো।

জাভেদ হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো পাশ ফিরে।

অগত্যা বনহুরও বালির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে তাকালো আকাশের দিকে। সমস্ত ঘটনা ছায়াছবির মত মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। মিঃ আহাদ, রাণী এবং জাহাজের সবাই ভাবছে আমি মরে গেছি। কারণ তখন যে অবস্থা তাতে মৃত্যু ছাড়া জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবো তেমন কোনো ভরসা ছিলো না। আল্লাহর অসীম কৃপায় জীবন রক্ষা পেয়েছে, রক্ষা পেয়েছে জাভেদ–এমন কত কি এলোমেলো ভাবনা এসে জট পাকাতে লাগলো বনহুরের মাথায়। তারপর এক সময় ক্ষুধার জ্বালা আর ক্লান্তিতে গভীর আবেশে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের।

বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে। সূর্যের আলোতে চারদিক ঝলমল করছে। কিন্তু একি, জাভেদ কোথায়? একটা শূন্যতা বিরাজ করছে চারদিকে। বনহুর বালুকারাশির ওপর দেখলো পায়ের ছাপ। যে ছাপ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

কিন্তু বেশিদূর তাকে যেতে হলো না, দেখলো এবার পদচিহ্ন মুছে গেছে, কারণ ঘন দুর্বাঘাসের মত এক ধরনের ঘাস রয়েছে যার ওপর পায়ের ছাপ বুঝবার কোনো উপায় নেই।

বনহুর ঠোঁট কামড়ালো, অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা তার বুকের মধ্যে দাহ সৃষ্টি করলো। জাভেদকে খুঁজে পেয়েও হারাতে হলো। কান্দাই ফিরে গিয়ে নূরীর কাছে কি জবাব দেবে। বিষণ্ন মনে বসে পড়লো বনহুর।—- তাকে ক্ষুধা-পিপাসা কাতর করে তুলেছিলো। সব ভুলে বারবার মনে পড়ছে জাভেদের কথা। জাভেদ শুধু তাকে ভুলে যায়নি, ভুলে গেছে তার নিজের সবাইকে।

না জানি জাভেদকে সন্ন্যাসী কি এমন ওষুধ খাইয়েছিলো যার দরুন সে সবকিছু বিস্মিত হয়েছে। যদিও সে স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেতো তাহলে অন্ততঃ পক্ষে তাকে চিনতে পারতো। তাকে চিনতে পারলে জাভেদ এমন করে একেবারে পালাতে পারতো না।

বনহুর তাকালো সম্মুখের দিকে।

দূরে অনেক দূরে গ্রাম বা নগরী অথবা ঘন বন-জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে বনহুরের। ভালভাবে লক্ষ্য করছে সে। ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের জন্য ফলমূল, পানীয়ের প্রয়োজন।

এবার বনহুর এগুতে লাগলো।

কোমল দুর্বাঘাসের ওপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেও কোনো পদচিহ্ন দেখতে পেলো না। তবু এগুচ্ছে বনহুর লক্ষ্য তার সম্মুখে, দূরে বহু দূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ঘন কালো রেখার মত কোনো বস্তু–বন-জঙ্গল কিংবা শহর–বন্দর অথবা গ্রামাঞ্চল……যদি কোনো খাবার পাওয়া যায়। সেই আশায়……

পা দুখানা বড় অবশ লাগছে।

ক্ষুধা-পিপাসা তাকে একেবারে কাতর করতে না পারলেও বেশ কাবু করে ফেলেছে।

বনহুর চলছে।

বহুক্ষণ চলার পর যখন সেই ঘন কালো রেখার নিকটবর্তী হতে লাগলো তখন স্পষ্ট দেখতে পেলো শহর বন্দন নগর অথবা গ্রামাঞ্চল নয়–গভীর জঙ্গল। এতক্ষণ বড় আশা নিয়ে এগুচ্ছিলো বনহুর, এবার হতাশ হয়ে পড়লো। বেশ বুঝতে পারলে, জাভেদ ঠিক এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া বড় মুস্কিল।

বহুক্ষণ একটানা চলার পর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলো, এবার সে একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসে পড়লো। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলো।

অনেক দূর দৃষ্টি চলে গেলো। একদিকে শুধু ধূ ধূ বালুকারাশি, অন্যদিকে গভীর ভয়ংকর জঙ্গল। এমন বনে হিংস্র জীবজন্তু নিশ্চয়ই বসবাস করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর একটু বিশ্রাম করার পর উঠে পড়লো এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চললো। হঠাৎ যদি জাভেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে পরম সৌভাগ্য ....নইলে নূরীর কাছে কি করে গিয়ে দাঁড়াবে আর কিই বা জবাব দেবে! জাভেদ কি তাহলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলো হাজার হাজার মাইল দূরে এই অজানা এক জঙ্গলে.......

হঠাৎ ভীষণ একটা শব্দ?

এ শব্দ বনহুরের পরিচিত।

বনহুর চট করে ফিরে তাকালো, একটি বিরাট বাঘ তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

বাঘটা তার অতি নিকটে এসে পড়েছে।

ভীষণ আর ভয়ংকর তার চেহারা।

বনহুর তৈরি হয়ে দাঁড়ালো।

এমন জঙ্গলে এ ধরনের হিংস্র জীবজন্তু থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া এসব জীবজন্তু কোনোদিন মনুষ্যনামী জীব দেখেছে কিনা কে জানে। কিন্তু দস্যু বনহুর ওসব তোয়াক্কা করে না, সে তাড়াতাড়ি পাশের ছোট গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিলো।

ততক্ষণে বাঘটা বনহুরের ওপর লাফিয়ে পড়লো। বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ালো।

পরক্ষণেই বনহুর ভয়ংকর রূপ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘটার ওপর। তার ডাল দিয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো।

বনহুর আর বাঘে যখন লড়াই চলছিলো তখন হঠাৎ একটি বর্শা সমূলে বিদ্ধ হলো বাঘটির পাজরে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গর্জন করে উঠলো যন্ত্রণায়। সে কি ভীষণ আর ভয়ংকর গর্জন। পরক্ষণেই কাৎ হয়ে পড়ে গেলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো। জনমানবশূন্য স্থানে কে তাকে এভাবে রক্ষা করলো? তবে কি জাভেদ......একটা আনন্দদূতি বিদ্যুৎগতিতে বনহুরের মনকে উদ্দীপ্ত করে তুললো।

কিন্তু ভালভাবে তাকাতেই দেখলো একটি বিশ বাইশ বছরের তরুণী দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোঁপের পাশে।

অবাক হলো বনহুর।

তরুণীর পরনে শুধু হরিণের চামড়া। বুক হতে হাঁটু পর্যন্ত।

বনহুরকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তরুণী নিজের চেহারার দিকে নিজেই দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।

তরুণী তারপর ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো।

বনহুর তাড়াতাড়ি উঠে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কপাল এবং দেহের বিভিন্ন জায়গা হতে রক্ত ঝরছিলো। বনহুরের দেহের জামাকাপড় লালে লাল হয়ে উঠলো।

তরুণীটি বিস্ময়কর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর ইশারা করে বললো–আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। আমাকে পানি খেতে দিতে পারো?

তরুণী বনহুরের ইশারা বুঝতে পারলো বলে মনে হলো। সে তাকে কি যেন বললো।

বুঝতে পারলো না বনহুর তার কথার এক বর্ণও।

তরুণী এসে হাত ধরলো বনহুরের।

অবাক হলো বনহুর।

কারণ তরুণী এত সহজে তার কাছে আসবে ভাবতে পারেনি সে। বনহুর বাধা দিলো না বা হাত সরিয়ে নিলো না। তরুণী বনহুরের হাত ধরে নিয়ে চললো।

ভাবতেও পারেনি বনহুর তার ভাগ্য এমন প্রসন্ন হবে। সে বাধ্য ছাত্রের মত তরুণীর সঙ্গে এগিয়ে চললো। কিন্তু বনহুর ভীষণ অবাক হচ্ছে, এমন গভীর জঙ্গলেও মানুষ আছে! তবে কি জাভেদ এই জঙ্গলে এসে এমন কারও হাতে পড়েছে......যদি তাই হয় তবু ভাল বেচারা ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটা অগ্নিকুন্ড সামনে পড়লো। বিরাট একটা মূর্তির সামনে অগ্নিকুন্ডটা জ্বলছিলো। এত ঘন জঙ্গল যে, অগ্নিকুন্ডের আলোর ছটা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

বিরাট মূর্তিটার আকৃতি ভীষণ আর ভয়ংকর।

মূর্তিটা পাথরের তৈরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জমকালো পাথরের তৈরি।

সামনে অগ্নিকুন্ডের লালচে আভায় মূর্তিটা অদ্ভুত দেখা যাচ্ছে। দুচোখে বিস্ময় নিয়ে দেখছে বনহুর। তরুণী কখন পেছন থেকে সরে গেছে লক্ষ্য করেনি। বনহুরের সামনে এসে যখন দাঁড়ালো তরুণী তখন তার হাতে একটি ঠোলে কিছু পানি আর একটি পাত্রে কিছু শক্ত বস্তু।

বনহুর তরুণীর হাতে পানির পাত্র দেখামাত্রই দ্রত পাত্রটি নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করলো। ঠান্ডা সচ্ছ পানি।

খুব খুশি হলো বনহুর পানি পান করে কিন্তু অপর পাত্রে কি বস্তু তা সঠিক বুঝতে পারলো না। বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তরুণীর হস্তস্থিত পাত্রটির দিকে।

তরুণী হাতখানা পাত্রসহ এগিয়ে ধরলো।

বনহুর বুঝতে পারলো তরুণী তাকে ঐ বস্তু অথবা খাবারগুলো খেতে বলছে। কিন্তু সেগুলো কি তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সামান্য কিছুটা হাতে নিয়ে মুখে দিলো

বনহুর। একটু চিবিয়েই বুঝতে পারলো সেই বস্তুগুলো নারকেল জাতীয় কিছু হবে। রৌদ্রে শুকিয়ে অথবা আগুনে ঐগুলো খাদ্যে পরিণত করা হয়েছে।

মন্দ লাগছে না খেতে।

বনহুর গোগ্রাসে খেতে লাগলো।

ওদিকে বিরাট আকার মূর্তিটার সামনে অগ্নিকুন্ডটা দপ দপ করে জ্বলছে। মূর্তিটা যেন তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। অবাক লাগছে বনহুরের, তবু তো খাবার পেলো কিছুটা।

কি বলে তরুণীটিকে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পাচ্ছে না বনহুর। ওদের ভাষা বনহুর জানে না, বোঝে না কিছুই। তবু হাসিমুখে বললো–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু বনহুর তখন জানতো না তাকে কেন তরুণী এখানে নিয়ে এসেছে।

একটু পরেই সে অনুধাবন করলো।

কয়েকজন জংলী এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

একজন হয়তো ওদের সর্দার হবে, মাথায় মস্ত বড় পালকের তাজ মানে মুকুট। শরীরে হিংস্র জীবজন্তুর ছবি। বনহুর যদিও এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো না এ মুহূর্তে তবু ঘাবড়ে গেলো না সে।

তাকালো বনহুর তরুণীর মুখের দিকে। তরুণীর মুখে বনহুর ভীতি আর দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করলো। একটু পূর্বে বনহুর তরুণীটিকে অবিশ্বাস করেছিলো, হয়তো বা সেই তাকে কৌশলে ধরিয়ে দিচ্ছে জংলীদের হাতে। আসলে তরুণীটিও ঠিক বুঝতে পারেনি অতিথিটিকে তার বাবা হিংস্রতার চোখে দেখবে। নারী হৃদয় কোমল, তাই বনহুকে দেখে তার বড় মায়া হয়েছিলো, নিয়ে এসেছিলো বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে–কিন্তু যখন সে তার বাবা মানে সর্দারকে ক্রুদ্ধমূর্তিতে দেখলো তখন বেশ ভীত হয়ে পড়লো।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো কয়েকজন জংলী একটি গাছের ডালের সঙ্গে লতা দিয়ে বেঁধে সেই মৃত বাঘটিকে বয়ে নিয়ে এসেছে।

বাঘটির দেহটা ওর মূর্তিটির সামনে শুইয়ে দিলো। জংলীদের সবার মন ব্যথায় জর্জরিত। বাঘটি যেন ওদের পরম আত্মীয় ছিলো।

ক্রুদ্ধ সর্দার আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো বনহুরকে, তার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো।

তরুণী ছুটে গিয়ে সর্দারের পা জাপটে ধরে কিছু বললো তারপর আংগুল দিয়ে দেখাতে লাগলো বাঘটা।

বনহুর বুঝতে পারলো বাঘটা সে নিজে মেরেছে তাই সে সর্দারকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। জংলীদের সবার চোখেমুখেই একটা বিস্মিত ভাব ফুটে উঠলো।

সর্দার কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার দলবলকে লক্ষ্য করে তরুণীটিকে দেখালো।

তরুণী আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো।

কয়েকজন জংলী লতা বা গাছের ছাল দিয়ে তরুণীকে বেঁধে ফেললো। তরুণীর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে করুণ ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর বেশ উপলব্ধি করতে পারলো বাঘটাকে হত্যা করার কারণেই সর্দার ও অন্যান্য জংলী ভীষণ ক্ষেপে গেছে। তারা সর্দারের কন্যাকে বেঁধে ফেললো। হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে দুটো গাছের সঙ্গে মাজায় রশি বেঁধে দুদিকে বাধলো।

বনহুর মুক্ত, তাকে ওরা কিছু বললো না বরং সর্দার বনহুরকে একটা গাছের গুঁড়ির আসনে বসতে ইংগিত করলো।

সর্দারের কথামত আসন গ্রহণ করলো বনহুর।

এবার সর্দার নিজের লোকদের লক্ষ্য করে কি সব বললো।

তরুণী ডুকরে কেঁদে উঠলো তার কথায়।

অন্যান্য যে সব জংলী ছিলো তারাও সর্দারের সঙ্গে যোগ দিয়ে অদ্ভুত এ শব্দ করতে লাগলো।

এই শব্দ শোনামাত্র চারিদিক থেকে অনেক জংলী নারী–পুরুষ ছুটে এলো, সবাই বিস্ময়ভরা চোখে জংলী সর্দার এবং তার কন্যাকে দেখতে লাগলো যার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে, মাজায় রশি বেঁধে দুটো গাছের সঙ্গে টান করে বাধা হয়েছে।

সবাই মৃত বাঘটাকে লক্ষ্য করলো। তাদের চোখেমুখেও একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠলো। তারা বুঝতে পেরেছে সর্দারের বেটি বাঘটাকে হত্যা করেছে।

সর্দার এসে দাঁড়ালো মূর্তিটার সামনে।

অগ্নিকুন্ডটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কারণ নতুনভাবে আরও শুকনো কাঠ দেওয়া হলো অগ্নিকুন্ডটার মধ্যে। যতই কাঠ পাচ্ছে ততই অগ্নিদেবতা যেন তার লেলিহান জিহ্বা আরও বেশি প্রসারিত করে দিচ্ছে।

বনহুর বসে অবাক হয়ে দেখছিলো বটে কিন্তু তার চোখমুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কারণ জংলী তরুণীটি তাকে রক্ষা করতে গিয়েই বাঘটাকে হত্যা করেছিলো। তার কোনো অপরাধ নেই অথচ সর্দার তাকে সেই ভয়ংকর বাঘটা হত্যা করার জন্যই নির্মম শাস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বনহুরের মন ব্যথায় জর্জরিত হলো।

সে তাকাচ্ছে তরুণীটির দিকে। বড় মায়া লাগছে বেচারীর এ অবস্থার জন্য দায়ী সে–ই। তাকে বাঁচাতে গিয়েই তার এ অবস্থা। তা হলে কি এরা বাঘের পূজা করে? হয়তো ভাই হবে না। হলে সর্দার তরুণীর এ অবস্থা করতো না।

বনহুরের হাত-পা মুক্ত, ভাবছে না জানি কোন মুহূর্তে তাকেও ওরা এই অবস্থা করবে। না জানি তার জাভেদ কোথায়। তারও কি এই অবস্থা হয়েছে।

চমকে উঠলো বনহুর একজন স্বর্গধারী যমদূতের মত জংলী এগিয়ে আসছে। তারা তরুণীকে হত্যা করবে বলে মনে হচ্ছে। বনহুর চমকে উঠলো, যদিও সে নিজে একজন দস্যু তবুও তার মনটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

ওরা তরুণীকে ধরে তার মাজার বাধন খুলে ফেললো এবং তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে সেই বিকট আকার মূর্তিটার সামনে নিয়ে গেলো।

জংলী সর্দার তার দলবলকে কি যেন বললো।

সবাই মাটিতে লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো, যাকে বলে সষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত।

খর্গধারী লম্বা হয়ে শুয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়ালো। অগ্নিশিখার লালচে আলোতে খর্গটা চক চক করছে।

বনহুর কিন্তু তখনও মুক্ত অবস্থায় বসে আছে কাঠের গুঁড়িটার ওপরে। তার দিকে কারও তেমন লক্ষ্য নেই। বনহুর সব কিছু লক্ষ্য করছে মনোযোগ সহকারে।

তরুণীটিকে ওরা ওদের দেবতার কাছে নিয়ে উঁচু করে ধরলো।

খর্গধারী প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

এবার সর্দারের নির্দেশ পেলে ওকে তারা খর্গদ্বারা দ্বিখন্ডিত করবে।

বনহুর ঐ দন্ডে নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, যে মুহূর্তে সর্দার নির্দেশ দিলো ঐ মুহূর্তে খর্গধারী তার খর্গ তরুণীটির কাঁধে বসিয়ে দিতে গেলো। আর সংগে সংগে বনহুর লাফিয়ে পড়লো ওর ওপর।

স্বর্গসহ পড়ে গেলো জংলিটা মুখ থুবড়ে।

বনহুর সেই দন্ডে খর্গটা কেড়ে নিলো এবং স্বর্ণ দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলো খর্গধারীর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে খর্গধারীর মাথাটা দেহ থেকে দ্বিখন্ড হলো।

রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো বনভূমির শুকনো মাটি। সর্দারসহ সকলে স্তম্ভিত হলো। বনহুর এবার সর্দারকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো।

তরুণী বনহুরকে বাধা দিলো এবং হাত জুড়ে কিছু বললো। হয়তো বললো– আমার বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও……।

বনহুর খর্গসহ হাত খানা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলো।

অন্যান্য জংলী নীরব দর্শকের মত নিশ্চুপ বনে গেছে। তারা কিছুতেই এক পা অগ্রসর হচ্ছে না বা পিছু হটছে না।

সর্দার তরুণীকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

অন্যান্য সবাই আনন্দধ্বনি করে উঠলো। বনহুর বুঝতে পারলো সর্দার ও তার কন্যা মিলিত হওয়ায় সবাই খুশি হয়েছে।

সেই ফাঁকে বনহুর সরে পড়লো সেখান থেকে।

*

সমস্ত দিন ধরে চলার পর বনহুর এক সময় সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলো। ভীষণ আর প্রচন্ড বেগে ঢেউগুলো গর্জন করে ছুটে আসছে তীরের দিকে। ওপার বলে কিছু নেই সব এলাকার, সীমাহীন জলরাশি। আকাশ আর সমুদ্র মিলে এক হয়ে গেছে।

বড় ক্লান্ত বনহুর।

ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়াও দারুণ দুশ্চিন্তা, না জানি এই অজানা স্থানে জাভেদ কোথায় হারিয়ে গেলো। সে জীবিত আছে না মারা গেছে কে জানে।

আবার রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো!

আকাশে ফুটে উঠলো তারার মালা। সমুদ্রের হিমেল হাওয়া হাড়ে কাঁপন ধরায়। বনহুর জড়োসড়ো হয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়ে, কাল রাতে তার পাশে ছিলো জাভেদ আর আজ সে একা। নানা ধরনের চিন্তা বনহুরের মনকে অস্থির করে তুলছিলো। রাণী এবং মিঃ আহাদ চৌধুরী তারা ভাবছে বনহুর চিরতরে সমুদ্রের অতলে হারিয়ে গেছে। হয়তো তারা তাদের জাহাজ নিয়ে ফিরে গেছে তাদের আস্তানায় ইংরেজদের জাহাজখানা তার চোখের সামনে নিমজ্জিত হলো সমুদ্রবক্ষে। হিংস্র জীবজন্তুগুলোসহ ইংরেজগণ জীবন্ত অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো। এ সব বনহুরের চোখের সামনে ঘটে গেলো, এত বিপদেও বনহুর ধৈর্য হারায়নি, সে ইংরেজ বণিকদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হয়েছিলো জাভেদকে। কিন্তু জাভেদকে উদ্ধার করেও কোনো ফল হলো না, ধরে রাখতে পারলো না তাকে……তারপর কখন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে খেয়াল নেই বনহুরের।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের।

কিন্তু একি, নড়তে পারছে না, কেন? তার হাত পা সব যেন কে রশি দিয়ে বেঁধেছে, একটু নড়বার মত শক্তি নেই। চোখ মেলতেই দেখলো, একটা অক্টোপাশ তাকে বেষ্ঠন করে ধরেছে। সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আজ, এই অক্টোপাশের কবল থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। আরও কয়েক বার বনহুর অক্টোপাশের কবলে পড়েছিলো কিন্তু নানা উপায়ে উদ্ধার পেয়েছিলো সে।

বনহুর নানাভাবে নিজকে অক্টোপাশটির কবল হতে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। অক্টোপাশটি বনহুরকে ধরে সমুদ্রে নেমে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর কিছুতেই নিজকে ধরে রাখতে পারলো না, অক্টোপাশটি তাকে নিয়ে সমুদ্রগর্ভে নেমে গেলো। বনহুর অবাক হচ্ছে অক্টোপাশটি এতক্ষণ জীবিত রেখেছে তাকে। সমুদ্রবক্ষেনমেও তার মুখ গহ্বরে দেয়নি তাকে।

অক্টোপাশের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও বনহুর দেখতে পেলো সমুদ্রের গভীর পানির তলে একটি বিরাট ডুবুজাহাজ। অক্টোপাশটি তাকে ঐ জাহাজটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বনহুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তবু সে ঘাবড়ে যায়নি কারণ বনহুর জানে মরতে তাকে একদিন হবেই। তাকিয়ে সে দেখছে জাহাজটির গায়ে বড় বড় গর্ত বা ফোকড়া রয়েছে। অক্টোপাশটি তাকে নিয়ে জাহাজের গায়ে প্রবেশ করলো। ফোকড়াগুলি বেশ বড় ছিলো, অক্টোপাশটা বনহুরকে নিয়ে অনায়াসে প্রবেশ করলো।

জাহাজের ভিতরে অদ্ভুত বিস্ময়কর মেশিন।

একটি বিস্ময়কর ক্যাবিনে অক্টোপাশটি তাকেসহ প্রবেশ করলো এবং আশ্চর্যভাবে তাকে মুক্ত করে দিয়ে ক্যাবিনের একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লো। তারপর আরও অবাক হলো বনহুর, অক্টোপাশটির মুখগহ্বর হতে ভীষণ শব্দ করে একরাশ হাওয়া বেরিয়ে গেলো।

বনহুর মুক্ত, সে দুচোখে বিস্ময় নিয়ে দেখছে এই অদ্ভুত কান্ড। আসলে ওটা অক্টোপাশ নয়, অক্টোপাশ আকারে একটি বৃহদাকার এবং ভীষণ শক্ত মোটা টায়ার বা রাবার জাতীয় বস্তু। কৌশলে এবং মেশিন দ্বারা ওটা চালনা করা হয়েছে, কিন্তু কারা এরা? বনহুর অবশ্য অবাক হলেও কতটা আশ্বস্ত হয়েছে, যাক এ মুহূর্তে তাহলে মৃত্যু তার হয়নি বা হলো না। কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে

সে। আর যেটাকে এতক্ষণ অক্টোপাশ মনে করেছিলো সেটা আসলে অক্টোপাশ নয়, একটা রাবার জাতীয় মেশিন।

বনহুর যখন ভাবছে তখন তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক ব্যক্তি। মুখে মুখোশ, যাতে তাকে সহজে কেউ চিনতে না পারে। লোকটির সঙ্গে আরও দুজন সহচর রয়েছে তাদের মুখেও মুখোশ। প্রত্যেকের পিঠে অক্সিজেন পাইপ লাগানো রয়েছে। অদ্ভুত ড্রেস, মাথায় বিস্ময়কর তাজ মানে শিরস্ত্রাণ।

বনহুরকে নির্বাক হয়ে ভাবতে দেখে প্রথম ব্যক্তি বললো–বনহুর ভেবেছিলো আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে। হাঃহাঃহাঃ– জলদস্যু হামবার্ড মরেনি, তোমার সামনে দন্ডায়মান।

তুমি! তুমি জীবিত আছো হামবার্ড বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর।

হামবার্ড সে তো মরে গেছে অনেক দিন।

জলদস্যু হামবার্ড।

যে জলদস্যুর ভয়ে জলপথের নাবিকগণ সদা–সর্বদা ভীত আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো। যাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত করা হয়েছিলো সেই হামবার্ড জীবিত। তখন বনহুর ঝম শহরে, রাজকন্যা ইলোরাকে এই নরপশু হরণ করেছিলো এবং সাগর তলে গোপন আস্তানায় বন্দী করে রেখে কয়েক কোটি টাকা রাজা মহেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়ে ছিলো। ঝম শহরে এ কথা বনহুরের কানে যায়। বনহুর এই জলদস্যু হামবার্ডের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলো, কারণ হামবার্ড বনহুরের জাহাজ উল্কার উপর হামলা চালিয়ে বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সে এবং তার দল হত্যা করেছিলো আর লুণ্ঠন করেছিলো জাহাজের মালামাল। বনহুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো এ সংবাদে।

ঐ খবরটা রহমানের মুখেই জানতে পারে এবং ঝাম শহর থেকে ঐ দিনই বিমান যোগে রওনা করেছিলো বনহুর, তারপর জলদস্যু হামবার্ডের ওপর সে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

হামবার্ড পরাজিত হয়েছিলো সেদিন বনহুরের কাছে। ভাবতেও পারেনি সেদিন হামবার্ড বনহুর তাকে এমনভাবে আক্রমণ চালাবে। সমস্ত জাহাজখানাতে বনহুর আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো এবং সেই আগুনে হামবার্ডও পুড়ে মারা গেছে....

কি ভাবছো বনহুর? ভাবছো তুমি আমাকে পুড়িয়ে মেরেছো আমার জাহাজে। কিন্তু জানোনা হামবার্ড বিশ্বজয়ী জলদস্য। তাকে হত্যা করতে পারে এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। একটু থেমে পুনরায় সে বললো বনহুরকে লক্ষ্য করে তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও হত্যা করতে পারেনি কিন্তু আমাকে তুমি মানুষ রাখোনি দৈত্যে পরিণত করেছে……

বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো, হামবার্ডের কথার শেষ অংশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। সে মানুষ ছিলো তাকে কি করে দৈত্যে পরিণত করেছে বনহুর। কথাটা আশ্চর্যজনক মনে হলো তার কাছে।

একটু থেমে বললো হামবার্ড–ভেবেছিলে আমাকে তুমি হত্যা করেছো। আর কোনোদিন তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবোনা। কিন্তু আমি ভুলিনি, ভুলতে পারবো না। তোমাকে ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু তাও করবো না। আমি তোমাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেবো……তাই জীবিত রেখেছি আজও।

এবার বনহুর কথা বললো–হামবার্ড, আমাকে দিয়ে কার্য উদ্ধার করে নেবে। কিন্তু কি কাজ যা তুমি পারো না?

আজ নয় পরে সব জানতে পারবে। এখন তোমাকে এমন এক স্থানে আনা হলো বা হয়েছে যে স্থান হতে তুমি কোনোদিন পালাতে সক্ষম হবে না। আমরা তোমাকে আজীবন কৃতদাস করে রাখবো।

জলদস্যু হামবার্ড যে জীবিত এবং সে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এ যেন এক বিস্ময়। এখনও বনহুর বিশ্বাস করতে পারছে না কিছু।

বনহুরকে নীরব থাকতে দেখে বললো মুখোশধারী তুমি এখন গভীর জলের তলদেশে রয়েছো।

তা আমি জানি। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো।

হামবার্ড বললো–তুমি জানো?

হাঁ

কিন্তু তোমাকে কি করে খুঁজে বের করলাম বলতে পারো?

আমি জ্যোতিষী নই কাজেই তুমি আমাকে সেই নির্জন সমুদ্র তীরে কিভাবে খুঁজে পেলে আমি কি ভাবে বলবো?

তুমি কোন স্থানে দেখতে চাও বলো, আমি তোমাকে সেই স্থান দেখাবো। এমন একটি মেশিন আমার আছে যা দ্বারা মনের চিন্তাধারাকে সেই পর্দায় স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ অদ্ভুত মেশিনটা যখন থেকে পেয়েছি তখন হতে আমি তোমাকে লক্ষ্য করে আসছি।

সত্যি! তুমি কথা বলছো? বনহুর অবাক বিস্ময়ে কথাটা বললো।

জলদস্যু হামবার্ড হেসে বললো–হাঁ, হাঁ বনহুর। আমি সেই মেশিনে তোমার অসীম দুঃসাহসী কাজও দেখেছি। দস্যুরাণীর নির্দেশে তুমি সাগর তলে ডুবন্ত এবং ভগ্ন জাহাজ হতে সাতরাজার ধন মহামূল্যবান সম্পদ মাণিক তুমি উদ্ধার করে এনে দিলে।

হামবার্ড।

হাঁ, আমি সব দেখেছি, দেখেছি তোমার অদ্ভুত দুঃসাহসী কার্যকলাপ যদিও তুমি আমাকে হত্যাই করেছো তবু আমি তোমাকে হত্যা না করে জীবিত রেখেছি এবং তোমাকে ছায়ার মত আমার লোক নানা ছদ্মবেশে অনুসরণ করেছে।

বনহুর যেন ওর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না।

হামবার্ড না তার প্রেতআত্মা?

বনহুর নিজের মনকে প্রশ্ন করে। তার চোখে–মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে কারণ সে ভীষণ ক্ষুধার্ত।

হঠাৎ বলে উঠলো হামবার্ড–ভোমার মুখ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বনহুর তোমাকে আমি শুধু মুক্তি ছাড়া যা চাইবে তাই দেবব, যদি তুমি আমার বাধ্য থাকো।

কি রকম? বললো বনহুর।

হামবার্ড ক্যাবিনে পায়চারী করতে শুরু করলো, কি যেন ভাবছে সে। অনুচর দুজন ক্যাবিনের দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আলোতে চক চক করছে ওদের দেহের পোশাকগুলো, মুখে ওদের মুখোশ হলেও সাধারণ, কিন্তু জলদস্যু হামবার্ডের মুখের মুখোশ অদ্ভুত ধরণের। বনহুরের কথায় বললো হামবার্ড তোমার দ্বারা আমি অসাধ্য সাধন করতে চাই! বলো রাজি? আর রাজি না হয়েই বা কি করবে। যেখানে তুমি এসেছো সেখান থেকে কোনো ক্রমে পালাতে পারবে না।

বনহুর শুধু হাসলো।

হামবার্ড বললো–উত্তর দাও–রাজি?

হ্যাঁ, রাজি।

হামৰাৰ্ড সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো–যাও, ওর জন্য খাবার নিয়ে এসো।

চলে গেলো ওরা দুজন।

বনহুর ভালভাবে তাকালো ছাদের দিকে এবং চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে লাগলো। সত্যি বিস্ময়কর বটে। নানা ধরণের কলকজা আর মেশিনাদি।

বনহুর চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এমন সময় খাবার নিয়ে এলো হামবার্ডের সহচরদ্বয়।

ফল-মূল তুমি ভালবাসো, তাই তোমাকে ফল–মূলই দিলাম। আর যে পানীয়ও দেখছো এটা বিশুদ্ধ, বিনা দ্বিধায় খেতে পারো।

বনহুর ভাবলো এবং বিশ্বাস করলো হামবার্ড তাকে ইচ্ছা করলে যে কোনো ভাবে হত্যা করতে পারতো এ মুহূর্তে। এতক্ষণ যাকে হত্যা না করে জীবিত রেখেছে তখন নিশ্চয়ই এ সবে বিষাক্ত কিছু মেশাবে না বলেই তার ধারণা হলো।

ক্ষুধার্ত বনহুর খাবারের পাত্র হতে ফল তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

পানীয় পান করলো বনহুর বিনা দ্বিধায়।

হামবার্ড ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললো–তাহলে তুমি আমার কথা মেনে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ। গম্ভীর এবং শান্তকণ্ঠে বললো বনহুর।

হামবার্ড খুশি হয়েছে মনে হলো, একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ করলো হামবার্ড।

বনহুর ভাবছে অনেক কিছু।

দ্রুত গতিতে তার চিন্তাধারা গুলো মনের পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। কি কাজ যা তাকে দিয়ে করানো হবে। হয়তো জলদস্যু হামবার্ডের অসাধ্য সে কাজ, যা সে পারেনি তাই তাকে দিয়ে করাতে চায়……

বললাম তো ভেবে কোনো ফল হবে না, এখান হতে পালানো তোমার সম্ভব নয়, কাজেই রাজি……বলো রাজি?

বলছি তো রাজি।

হাঁ, সে কারণেই তোমাকে তোমার ইচ্ছামত খাবার পরিবেশন করেছি। তা ছাড়া তোমাকে আমি পিপীলিকার মত হত্যা করতে পারতাম। এবার অনুচর দুজনকে লক্ষ্য করে বললো হামবার্ড–ওকে ওর ক্যাবিন দেখিয়ে দাও। যাও ওর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

হামবার্ড বেরিয়ে গেলো।

এবার হামবার্ডের অনুচরদ্বয় এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের কাছে। একজন বললো–চলো বৎস এবার তোমার ক্যাবিনে।

বনহুর বাক্য ব্যয় না করে ওদের সঙ্গে এগুলো।

বিরাট ডুবু জাহাজ ভিতরে নানা ধরনের ক্যাবিন, এক একটা ক্যাবিনে নানা ধরনের মেশিন পত্র, কলকজা। ডায়নামা চলেছে তার একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ। বনহুর হামবার্ডের লোক দুজনের সঙ্গে একেবারে জাহাজখানার তলদেশে একটি ক্যাবিনে এসে উপস্থিত হলো।

সুন্দর ক্যাবিন বটে।

পরিচ্ছন্ন শয্যা।

মাত্র একটি বসার আসন।

পাশে একটি ছোট টেবিল।

বনহুর আসনটার উপরে দেহ এলিয়ে দিলো।

এবার লোক দুজন বেরিয়ে গেলো।

দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর এবার আসন ত্যাগ করে পায়চারী করতে শুরু করলো। যদিও এমন ধরনের বিপদ তার জীবনে এটা প্রথম বা নতুন নয়, তবু কম আশ্চর্য হয়নি। জলদস্যু হামবার্ডের এ বিস্ময়কর ডুবু জাহাজ। হামবার্ড মিথ্যা বলেনি। এখান হতে পালানো অসুবিধাজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর এবার শয্যা গ্রহণ করলো।

তার চিন্তাধারা খরস্রোতা নদীর মত এগিয়ে চলেছে। চিন্তার শেষ নেই, জাভেদ কোথায় নিরুদ্দেশ হলো কে জানে। কান্দাই ফিরে যেতে পারবে কিনা আর সে তাও জানেনা বনহুর। কিন্তু হামবার্ড সে দিন মরেনি না মরেও সে জীবিত আছে এবং তাকে সে সর্বক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। কি এমন মেশিন চারদিকে জলদস্যু হামবার্ড সব কিছু দেখতে পায়। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে বনহুর সেই যন্ত্র দ্বারা দেখতে পারে জাভেদ কোথায় কেমন অবস্থায় আছে। হামবার্ড হয়তো সত্য কথাই তাকে বলেছে কারণ সে এমন কৌশলে তাকে এই ডুবু জাহাজে নিয়ে এলো যে তা ভারী আশ্চর্যজনক। এমন দক্ষতার সঙ্গে অক্টোপাশ তৈরি করা হয়েছে যা বিস্ময়কর বটে। ভাবতেও পারেনি বনহুর অক্টোপাশটি সম্পূর্ণ নকল।

এমনভাবে হামবার্ড জলদস্যুতা করছে যে, তাকেও হার মানিয়েছে।

বিরাট ডুবু জাহাজসহ হামবার্ড সাগরবক্ষে তলিয়ে থাকে। সাগরে অন্য কোনো জাহাজ লক্ষ্য করলেই ডুবু জাহাজ নিয়ে হাজির হামবার্ড সেই জাহাজটির পাশে। এবং সুযোগ বুঝে ভেসে উঠে ঠিক ঐ জাহাজটির সামনে অথবা, পাশে। বাধ্য

করে জাহাজটিকে থামতে এবং অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় জাহাজটির যাত্রীদের ওপর।

যাত্রীগণকে হয় হত্যা নয় সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করে লুট করে নেয় তাদের যথাসর্বস্ব। তারপর লুণ্ঠিত জাহাজটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এমনি করে কত শত শত জাহাজ জলদস্যু হামবার্ড ধ্বংস করেছে, হত্যা করেছে নিরীহ মানুষদের। বনহুর যে জানতো না তা নয়। বনহুরও এই শয়তান হামবার্ডকে বহু খুঁজেছে। সে যে সাগরবক্ষে গভীর অতলে তলিয়ে পৃথিবীর বুকে দুঃস্কর্ম করে চলেছে এটা বনহুর জানতে পারেনি আর জানতে পারেনি বলেই হামবার্ড তার দৃষ্টির আড়ালে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে যাচ্ছে। বনহুর জানতে হামবার্ড মরে গেছে, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরে গেছে কিন্তু সে মরেনি আজও সে সাগরবক্ষে নিমজ্জিত থেকে দস্যুতা করে চলেছে।

বনহুর শয্যা গ্রহণ করে তারপর একসময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। যদিও বিপদ তার চারপাশ ঘিরে আছে তবুও তার দুচোখে নেমে আসে গভীর ঘুম।

*

মিঃ নূর, আপনি এমন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেন সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কথাগুলো বললেন মিঃ হারুন।

হাসলো নূর। কোনো জবাব সে দিলো না।

মিঃ আহম্মদ দক্ষ পুলিশ সুপার তিনি অল্প বয়সী নূরের তেজোদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে আনন্দিত হয়েছেন। যদিও পুলিশ সুপার হিসেবে তাকেই কাজ করতে হয়েছে তবু নূরের কাছে কৃতজ্ঞ তিনি। বললেন মিঃ আহম্মদ–আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য আমরা এতগুলো অসৎ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

বললো নূর–আমার কর্তব্য আমি করে যাচ্ছি, কাজতো হাসিল করছেন আপনারা।

মিঃ আহম্মদ হাসলেন, হেসে বললেন–আপনার বুদ্ধি বলেই এই সব গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার। হয়েছিলো। দুষ্কৃতিকারী যারা ঘুষ ও কালোবাজারী করে ঐশ্বর্যের ইমার গড়ে তুলেছিলো তাদের আমরা সায়েস্তা করতে সক্ষম হয়েছি......।

নূর গম্ভীর কণ্ঠে বললো–মিঃ আহম্মদ যারা গদি দখল করে বসে আছেন তারা কিন্তু এখনও আঁচ পাননি।

এবার মিঃ হারুন বললেন–হাঁ, এ কথা অবশ্য সত্য, কারণ যারা সাধুতার মুখোশ পরে স্বনামধন্য ব্যক্তি সেজে দেশ ও দশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কিন্তু ঠিক তেমনি রয়েছেন। তবে কান্দাই সরকার এ ব্যাপারে বার বার হুশিয়ারী সংকেত দিচ্ছেন, বিচারে কেউ রেহাই পাবেন না।

বললো নুর–তবু এদের হুশ হচ্ছে না। এই স্বনামধন্য ব্যক্তিরা মনে করছেন তাদের আসন চিরদিন অটল অক্ষয় থাকবে। কেউ কোনোদিন এদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু সময় কারো মুখাপেক্ষী নয়। একদিন যখন গদি সরে যাবে আপনা আপনি তখন টের পাবে বাছাধনরা। এখন তারা প্রশাসন মানতে চায় না। প্রশাসনকে হুকুমের দাস করে রেখেছে।

কিন্তু সময় এসে গেছে মিঃ নূর। গতি ত্যাগ করার পর এদের অবস্থা সাধারণ মানুষের চেয়ে জঘন্য অবস্থায় দাঁড়াবে। কথাগুলো বললেন মিঃ আহম্মদ।

নূর বললো–মিঃ আহম্মদ, আপনি যা মনে করছেন তা নয়। এরা গতিতে থাকাকালিন ভবিষ্যতের পথ পরিস্কার করে রাখছেন মানে গদিচ্যুত হলেও যেন পথে বসতে না হয়। বেনামী ইমার গড়ে রাখছেন–সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে কিন্তু সরকার ক্ষমা করলেও জনগণ ক্ষমা করবে না।

মিঃ নূর, আপনার বয়স হিসাবে আপনি বেশি দক্ষতা অর্জন করেছেন বলে আমাদের ধারণা। মিঃ আহম্মদ গদ গদ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ হারুন মৃদু হাসলেন, কারণ তিনি জানেন নূর কার পুত্র। মিঃ আহম্মদ জানেন না। এ কথা মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও ছাড়া কেউ জানতো না। যদিও প্রশাসন বিভাগের অনেকেই জানতেন তারা এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। আবার যারা নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন তারাও এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হয়ে গেছেন। অবশ্য তার পিছনে কারণ রয়েছে যথেষ্ট। মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও ভালভাবে সাবধান করে দিয়েছেন কিন্তু নূর প্রথমে না জানলেও আজ সে নিজে জানে সে কার সন্তান।

একদিন যার প্রতি তার ঘৃণার অন্ত ছিলোনা আজ তার প্রতি নূরের শ্রদ্ধা অপরিসীম। শুধু তার আব্বু বলেই সম্মান নয়, পরম এক মহৎ জন তার আব্বু আর এ কারণেই নূরের মনে এক চরম। সান্তনা। সত্যি তার আব্বু একজন পৌরুষদীপ্ত মানুষ।

কি ভাবছেন মিঃ নূর? বললেন মিঃ আহম্মদ।

বললেন মিঃ হারুন–কেমন করে এ সব সমস্যার সমাধান করা যাবে হয়তো এ চিন্তা তাকে চিন্তিত করেছে।

বললো নূর– আপনি যা বলেছেন সত্য। নবাব সিরাজদৌল্লার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে–তাঁর বান্দা গোলাম হোসেন যখন বলেছিলো, হুজুর আবার আমরা জন্মাবো। জন্ম–জন্মান্তরে শাস্তি দেব বেঈমান মীরজাফরের দলকে। গোলাম হোসেনের কথার জবাবে বলেছিলেন নবাব সিরাজদৌল্লা–গোলাম হোসেন মীরজাফরের দল কি আর জন্মাবেনা .....স্যার তাই ভাবছি চির দিন একশ্রেণীর লোক যারা নরপশুর দল, যারা শিক্ষিত হয়েও মূখের অধম তারা কি আর জন্মাবে না? এদের স্বভাব থেকে এরা বঞ্চিত হবে না কোন দিন কারণ এরা লোভ লালসার দাস।

মিঃ আহমদ বললেন–আমি জানি মিঃ নূর, আরও জানি সব কিছু, কিন্তু আমাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ আমরা চাকরি করি।

তাই বলে আপনারা অন্যায়কে মেনে নেবেন মিঃ আহম্মদ

হয়তো কোনো কোনো সময় বাধ্য হয়ে মানতে হয়। মনপ্রাণ ঘৃণায় ভরে ওঠে তবু মেনে নিতে হয়। যেমন ধরুন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সন্তান বা ভাগিনা অথবা পরম আত্মীয় জঘন্য ঘৃণ্যকাজে লিপ্ত হয়ে প্রশাসনিক শাস্তি প্রাপ্ত হলো তখন স্বনাম ধন্য কোনো ব্যক্তির টেলিফোন এলো, যার দরুন বাধ্য হতে হয় অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়ে মুক্তি দিতে হয় সেই দোষী ব্যক্তিদের.....অথবা......

নূর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–চাকুরি রক্ষার জন্য অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হন, কেন হন তাও জানি কিন্তু......

বলুন মিঃ নূর, থামলেন কেন? বললেন মিঃ আহম্মদ।

নূল বললো–পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ মানুষই কেউ কারো না কারো দাস…কথা সমাপ্ত না করে হাসলো নূর, তারপর বললো–যদিও কথাটা বলা আমার উচিৎ নয়, কারণ আমিও চাকুরি করছি মানে আমি নিজেও দাস এবং এ কারণেই অন্যায়কে আমরা বাধ্য হই মেনে নিতে। শুধু আমার আপনার দোষ নয় দোষ আমাদের জাতীয় চরিত্রের।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিঃ হারুন রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

ও পাশ থেকে ভেসে আসে একটি নারীর কণ্ঠ।

…আমি কি পুলিশ অফিসে কথা বলছি?

বললেন মিঃ হারুন….হা পুলিশ অফিস।

…আপনার পরিচয়?

…বলুন কাকে চান?

…আমি পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদকে চাই।

…আচ্ছা ধরুন দিচ্ছি। রিসিভারের মুখে হাত রেখে বললেন মিঃ হারুন–মিঃ আহম্মদ, আপনার ফোন। একজন মহিলা আপনাকে চাইছেন।

মিঃ আহম্মদ রিসিভারখানা মিঃ হারুনের হাত হতে গ্রহণ করে বললেন–বলুন?

…আপনি পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ

…বলছি, বলুন? বললেন মিঃ আহম্মদ।

…আজ রাত দুটোয় আপনি জেগে থাকবেন, আমি আসবো।

.আপনি কে বলছেন? আপনার পরিচয়?

…আমার পরিচয় দিলেও আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। কারণ আমি এই মাত্র বিমান যোগে কান্দাই পৌঁছেছি। আমার নাম রাণী।

…এটাই আপনার পরিচয়।

…হাঁ। এর বেশি জানতে চাইবেন না।

…আপনি কোথা থেকে বলছেন?

…বিমান বন্দর থেকে।

রিসিভার রাখার শব্দ শোনা গেলো।

মিঃ আহম্মদ বার বার টেলিফোনে ডাকলেন–হ্যালো হ্যালো….হ্যালো…

কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া এলোনা। রিসিভার রেখে দিয়েছে মহিলা। মিঃ আহম্মদ বললেন–আশ্চর্য।

মিঃ হারুন এবং নূরের মুখে বিস্ময়।

কারণ মিঃ আহম্মদ যখন কথা বলছিলেন তখন তারা অবাক হয়ে শুনছিলো, কারণ মিঃ আহম্মদের কথাগুলো স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো না।

মিঃ আহম্মদ রিসিভার রাখার সঙ্গে সঙ্গে বললেন মিঃ হারুন–ব্যাপার কি মিঃ আহম্মদ

নূরও তার উত্তর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো।

বললেন মিঃ আহম্মদ তাজ্জব ব্যাপার! একটি নারী কণ্ঠ

তারপর? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হারুন।

বললেন মিঃ আহম্মদ–রাত দুটোয় আপনি জেগে থাকবেন আমি আসবো। সত্যি আশ্চর্য সে কণ্ঠস্বর।

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ হারুন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন–বৃদ্ধ বয়সে কোনো তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নিশ্চয়ই।

মিঃ আহম্মদ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন–ব্যাপার রহস্যময়।

মানে? বললেন মিঃ হারুন।

নূর মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো তাদের কথাবার্তা। বললেন মিঃ আহম্মদ–আপনি যত সহজ ভাবছেন ব্যাপারটা তা নয় কারণ মহিলাটি বিমান বন্দর থেকে আমাকে টেলিফোন করেছেন। এই মাত্র তিনি নাকি বিমান বন্দরে অবতরণ করেছেন। রাত দুটোয় আসবেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে.......একটু থেমে বললেন–গলার স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সুমিষ্ট।

নূর বললো–আপনার পরিচিত কোনো ব্যক্তি অথবা বন্ধুর কন্যা হবে। যাক্ ঘাবড়াবার কিছু নেই।

মিঃ নূর, আপনি বলছেন ঘাবড়াবার কিছু নেই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দস্যু বনহুর তার কোনো সহচরীর দ্বারা পুলিশ অফিসে টেলিফোন করেছে। না হলে এমন কারো সাধ্য নেই আমার বাংলোর পুলিশ গার্ডদের বেষ্টনী ভেদ করে বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কথাগুলো বলে মিঃ আহম্মদ খুব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

মিঃ হারুন তাকালো নূরের মুখের দিকে।

নূর মাথাটা ফিরিয়ে তাকালো দরজার দিকে, সত্যি কি তাই......তার আব্বুর কোন......

নূরকে বেশিক্ষণ ভাববার সময় দিলেন না মিঃ হারুন বলে উঠলেন–আমার মনে হয় ফোন যিনি করেছেন তিনি মহিলা নাও হতে পারেন। হয়তো কোন ব্যক্তি আপনাকে অহেতুক হয়রানি করার জন্য.......

মিঃ আহম্মদ বললেন–আমার তাই মনে হচ্ছে, কারণ একজন মহিলা গভীর রাতে পুলিশ প্রধানের কক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যেতে পারেন না কিছুতেই। তা ছাড়া পুলিশ গার্ড রয়েছে।

নুর বললো–নিশ্চয় কোনো মহিলা মিঃ আহম্মদকে বিচলিত করার জন্য টেলিফোন করেছে। আমার মনে হয় তবু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

হাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ নূর, যদিও নারী কণ্ঠ তবু স্বাভাবিকভাবে বা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেদিন আর বেশি কথা বার্তা হয়না, মিঃ হারুন এবং নূর বিদায় গ্রহণ করলো।

*

গভীর রাত। মিঃ আহম্মদ তাকিয়ে আছেন দেয়াল ঘড়িটার দিকে। এখন পর্যন্ত একটুও ঘুম আসেনি তার চোখে, সত্যি যদি নারীকণ্ঠের কথাগুলো সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে আসবে মানে আসতে চেষ্টা করবে কিন্তু পুলিশ গার্ড যে ভাবে বাংলো পাহারা দিচ্ছে তাতে কারও সাধ্য নেই বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

কি ভাবছেন মিঃ আহম্মদ? সেই কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠে বসলেন মিঃ আহম্মদ। দুচোখে তার বিস্ময়, একি সত্য না স্বপ্ন! তার শয্যার পাশে দন্ডায়মান একটি অদ্ভুত জমকালো ড্রেস পরা নারী মূর্তি। তার হাতে তেমনি জমকালো রিভলবার।

অবাক হয়ে ভাবছেন কেমন করে আপনার বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করলাম?

হাঁ হাঁ, আপনি কে? কেমন করে বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

পুলিশ সুপারের মুখে–আমাকে আপনি বলা শোভা পাচ্ছে না, কারণ আমি সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

আপনি অপরিচিতা বলেই তো.......মিঃ আহম্মদ থামলেন।

জমকালো পোশাক পরিহিতা মহিলা বললো–আমার আসল পরিচয় জানলে আপনি আমাকে....থাক, পরে সব জানতে পারবেন। আজ আমি কেননা এসেছি তাই শুনুন। আমাকে আপনি তুমিই বলবেন, কারণ আপনার বয়স আমার পিতৃসমতুল্য। হাঁ, এবার কাজের কথা।

প্রথমে তুমি বলো কেমন করে আমার বাংলোয় প্রবেশ করলে?

বড় সাধ হচ্ছে শোনার তাই না?

যদি বলি হাঁ?

তবে শুনুন আমার লোক আপনার প্রতিটি গার্ডকে সংজ্ঞাহীন করে রেখেছে। আপনি চিৎকার করে ডাকলেও কেউ আসবে না আপনাকে রক্ষা করতে, কারণ সবাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যার যে স্থানে রয়েছে, এমনকি আপনার পরিবারের সবাই পাশের কক্ষে একই ভাবে গভীর নিদ্রায় অচেতন, কাজেই আপনি নীরবে আমার প্রশ্নের জবাব দিন?

মিঃ আহম্মদ বুঝতে পারলেন এ নারী স্বাভাবিক বা সাধারণ নয়। কে এই মহিলা যার নাম রাণী।

কি ভাবছেন মিঃ আহম্মদ?

কেন এসেছো এবার বলো? কি চাও তুমি আমার কাছে

আমি কোনো জিনিস নিতে আসিনি, কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই। কিছু জানতে এসেছি। আমার এক নম্বর প্রশ্ন–আপনি আমাকে মিঃ নূর এর বাসভবনে নিয়ে যাবেন এবং কান্দাই এর বিখ্যাত চৌধুরী বাড়ি কোথায় সেখানেও নিয়ে যাবেন। পরিচয় দেবেন আমি আপনার আত্মীয়া। আর হাঁ, প্রশ্ন হলো আপনি দস্যু বনহুরকে চেনেন কিনা এবং তার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা?

মিঃ আহম্মদ ঢোক গিলে বলল–দস্যু বনহুরকে শুধু আমি কেন সমস্ত কান্দাইবাসী চেনে।

বলেন কি? সত্যি তাকে কান্দাইবাসী সবাই চেনে?

হাঁ, তবে তাকে চাক্ষুস কেউ দেখেনি দুচারজন ছাড়া।

আপনি?

আমিও তাকে চাক্ষুস দেখিনি। তবে তার সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কিছু বলতে পারবো।

তাহলে সংক্ষেপে বলুন? রাণীর হাতে জমকালো রিভলভার চক চক করছিলো।

বনহুর সম্বন্ধে মিঃ আহম্মদ বললেন, যতখানি তিনি জানেন, তবে অনেক কিছুই বললেন–বনহুরের ভয়ে সমস্ত কান্দাইবাসী আতঙ্ক গ্রস্থ থাকেন, তবে বনহুর সাধারণ মানুষদের কোনো ক্ষতি সাধন করে না, এ কারণে একশ্রেণীর মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কিন্তু বেশ কিছুদিন হলো বনহুরের আবির্ভাব ঘটেনি।

অনেক কিছুই জানতে পারলো, বনহুর সম্বন্ধে। একটু কিছু ভাবলো রাণী, হয়তো বা সেই সমুদ্রগর্ভে বনহুরের ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে এই মুহূর্তে। না জানি সে জীবিত না মৃত। আর কোনোদিন সে কান্দাই ফিরে আসবে কিনা কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললো রাণী–আপনি প্রস্তুত থাকবেন কাল সকাল আটটায়। আমি আসবো এবং আপনি আমাকে নিয়ে মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরীর বাংলোয় আসবেন নচেৎ... রিভলভার দেখিয়ে বললো রাণী–ক্ষমা পাবেন না এটা থেকে।

বললেন মিঃ আহম্মদ–তোমার মতলব কি জানতে পারি কি?

আপনার সান্নিধ্যে যখন এসেছি সব জানতে পারবেন। কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো রাণী।

মিঃ আহম্মদ তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিলেন হাতে। কিন্তু একি, কোনো সাউন্ড নেই রিসিভারে। ফোনও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ মিঃ আহম্মদের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো, তিমি তাড়াতাড়ি শয্যায় শুয়ে পড়লেন।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রাণী।

এমন সময় কে যেন রাণীর সম্মুখে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো।

অন্ধকারে রাণী থমকে দাঁড়ালো।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর–আমি সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে তুমি কাল আটটায় সাক্ষাৎ করতে যেতে চাও।

তুমি মিঃ নূর?

হাঁ।

কি করে জানলে আমি এখানে আসব?

তুমি যেমন করে জানো, আমিও তেমনি করে জেনেছি।

বললো রাণী–তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতে পারিনি। যাক তুমি তা হলে আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছো?

হা শুনেছি।

কিন্তু আমাকে তুমি ফলো করার জন্য এত উৎসুক কেন?

আমি কে তুমি যখন জানো তখন আমাকে এ প্রশ্ন করা উচিৎ নয়, কারণ ডিটেকটিভদের কাজ অনুসন্ধান করে গোপন তত্ত্ব বের করা। আমি জানতে চাই আমার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন আছে? মিঃ আহম্মদের আত্মীয়ার পরিচয় দিয়ে আমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?

হাসলো রাণী।

অদ্ভুত সে হাসি।

নূর ইতিপূর্বে কোনো নারীকণ্ঠে এমন ধরনের হাসি শুনতে পায়নি। বললো নূর–হাসছো যে?

দুঃখে হাসি পাচ্ছে।

মানে?

মানো তুমি বড্ড কচি ছেলে অথচ তোমার বুদ্ধি একটি দক্ষ ডিটেকটিভের চেয়ে কম নয়। তোমার সঙ্গে তোমার বাসায় কথা বলতে পারলে ভাল হতো। যাক তুমি

যখন কচি ছেলে নও মানে বয়সের চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় বেশি অভিজ্ঞ তাই তোমাকে এখানে দাঁড়িয়েই কয়টি কথা বলে যাব। একটু থেমে বললো রাণী–আমি কোনো ক্রমে জানতে পেরেছি কান্দাই দস্যু বনহুরের রাজ্য.....

তুমি কি বলতে চাও দস্যু বনহুর কান্দাই অধিপতি?

নূর এমনভাবে কথাটা বললো যেন সে বনহুরের নাম ওর মুখে শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো আধো অন্ধকারে রাণীর মুখমন্ডলে। যদিও কালো কাপড়ে মুখের অর্ধেক অংশ ঢাকা ছিলো তবু নূর ডিমলাইটের স্বল্প আলোতে দেখতে পেলো রাণীর মুখের অর্ধাংশ। কোনো দিন তাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো না। বনহুর সম্বন্ধে এর এত জানার ইচ্ছাই বা কেন।

অধিপতি না হলেও তার আধিপত্য আছে জানি। ঐশ্বর্যশালীগণ তাকে ভয় পায় কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে যারা তার দয়ায় বেঁচে আছে তারা হলো বস্তি এলাকা এবং দুঃস্থ সমাজ আমি তাদের জন্য কিছু অর্থ দিয়ে যাবো তোমাকে যা তুমি ন্যায্যভাবে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে এবং আমি সেই কারণেই কান্দাই এসেছি, কাজ শেষ হলেই ফিরে যাবো।

তুমি কি তা হলে দস্যু বনহুরের পরম কোনো আত্মীয়া?

না!

তবে তার হয়ে তোমার এত দরদ কেন দস্যু বনহুরের স্নেহভাজনদের উপর।

হাঁ, তোমার মনে এ প্রশ্ন জাগবে বা জাগতে পারে আমি জানি। সেই কারণে কয়টি কথা তোমাকে বলতে হবে।

বলো আমি জানতে চাই?

প্রথম কথা তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। তোমাকে কোনো সময় আমি অবিশ্বাস করতে পারিনা যদিও তুমি বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উদগ্রীব রয়েছো।

কথাটা শুনে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো নূরের ঠোঁটের কোণে। বললো নূর–তুমি দেখছি সব খবর রেখেছে।

কান্দাই যখন আসতেই হলো, তাই কান্দাইয়ের বিশেষ বিশেষ খবরগুলো যথাযথভাবে সগ্রহ করে নিতে হয়েছিলো।

বনহুরের অনুগ্রহ ভাজনদের প্রতি তোমার সহানুভূতি আমাকে বিস্মিত করেছে। যদিও তোমার অর্থ আমি গ্রহণ করতে পারব না কারণ আমার নিজের যতটুকু আছে তা থেকে এই মানুষগুলোকে আমি নিজেও দিতে পারি।

রাণী অবাক হলো–এ কণ্ঠস্বর......এমন তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর, হঠাৎ স্মরণ হলো এর কণ্ঠের মিল আছে বনহুরের কণ্ঠের সঙ্গে। বনহুর কোনো কথায় একদিন তাকে বলেছিলো কান্দাই শহরে তরুণ ডিটেকটিভ মনিরুজ্জামান একটি প্রতিভা, তাকে দিয়ে নেক কিছু করানো যায়, তেমনি বিশ্বাস করা যায়......

কি ভাবছো? দয়া দেখানো হলো না?

যদি আমার অর্থ তুমি গ্রহণ করে দুঃস্থ কান্দাইবাসী যারা বনহুরের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করছে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে না পারে তা হলে আমাকেই কাজটা করে যেতে হবে। যার দয়ায় ওরা জীবনে বেঁচে আছে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে, সে আর কোনো দিন ফিরে আসবে কি না সন্দেহ.......

কি বললে? নূর যেন চমকে উঠলো, একটু কেঁপে গেলো গলাটা।

রাণী অন্ধকারে ভালভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো নূরের মুখের দিকে। কারণ নূরকে একটু বিচলিত মনে হলো।

ঐ মুহূর্তে বাইরে গাড়ির শব্দ হলো।

রাণী ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলো। সিঁড়ির আড়ালে জমাট অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সে।

নূর বুঝতে পারলো বাইরে গাড়ির শব্দ তাকে চকিত করে তুলেছিলো এবং সে কারণেই দ্রুত গা ঢাকা দিলো নারীমূর্তি কিন্তু কে সে? কি তার পরিচয়। তবে তার

আব্বুর সঙ্গে কি এর কোনো সম্বন্ধ ছিলো বা আছে! তার আব্বু আর কোনোদিন ফিরে নাও আসতে পারে, কথাটা তাকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

নূর ছুটে গেলো রাণী যেদিকে চলে গেছে সেই দিকে কিন্তু তার কোনো সন্ধান পেল না। বাইরে এসে দাঁড়াতেই নূর দেখলো মিঃ সেলিম এবং আরও কয়েকজন পুলিশ ফোর্স অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে হাজির।

মিঃ সেলিম মিঃ আহম্মদের সহকারী।

রাণী একাই কান্দাই আসেনি তার সহচর রহমত এবং আরও দুজন অনুচর এসেছে রাণীর সঙ্গে। এবং তারাই কৌশলে নানাভাবে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলো মিঃ আহম্মদ–এর গার্ড ও পরিবারের সবার খাবারে। রাণী জানে, বনহুর হয়তো আর কোনো দিন ফিরে আসবে না কিন্তু কান্দাই এ দুঃস্থ অসহায় মানুষগুলো পথ চেয়ে থাকবে, তাই রাণী এসেছে এদের সহায়তায় এগিয়ে।

সংজ্ঞা ফিরে এসেছিলো পুরনো চাকর আব্বুল্লার। সে অত্যন্ত চালাক ছিলো, জ্ঞানলাভ করার পর আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলো সে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলো পুলিশ অফিসে। পুলিশ অফিসে তখন ছিলো মিঃ সেলিম, কোনো জরুরী কাজে নিয়েজিত ছিলেন। তিনি আব্বুল্লার ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে চলে এসেছেন পুলিশ সুপারের বাংলোতে।

মিঃ সেলিম নূরকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন–আশ্চর্য আপনি এখানে?

হাঁ। বললেন নূর।

মিঃ সেলিম বললো–কি ব্যাপার মিঃ নূর?

ব্যাপার রহস্যজনক। আসুন দেখা যাক মিঃ আহম্মদের অবস্থা এখন কি?

মিঃ সেলিম এবং মিঃ নূর চলে এলেন সিঁড়ি বেয়ে।

মিঃ আহম্মদ ফ্যাকাশে মুখে শয্যায় শায়িত আছেন। মিঃ সেলিম আর মিঃ নূরকে একই সঙ্গে তার বাংলোয় প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিতও আনন্দিত হলেন তিনি। কণ্ঠ যেন তার রুদ্ধ হয়ে গেছে, কি যে, বলবে সে ভাষা তার নেই।

মিঃ সেলিম বললেন–স্যার, আপনার দুঃসংবাদ শুনে চলে আসছি কিন্তু দুস্কৃতিকারী কোথায়?

নূর সব জানে কাজেই সে নীরব।

মিঃ আহম্মদ বললেন–দুস্কৃতিকারী নয় দুস্কৃতিকারিণী......জমকালো পোশাক পরিহিতা এক নারী......তার কথাবার্তা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের.....আপনারা বসুন আমি সব বলছি.....মিঃ আহম্মদ বেশ ঘাবড়ে গেছেন বলে মনে হলো।

মিঃ আহম্মদ উঠে বসলেন।

মিঃ সেলিম ও নূর আসন গ্রহণ করলেন।

বললেন মিঃ আহম্মদ সব কথা।

নূর এবং সেলিম শুনলো।

বিস্ময়ের অবধি নেই মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ সেলিম। নূর যদিও নারীমূর্তির কথায় অবাক হয়েছে তবু কিছু তার জানা হয়ে গেছে। নারীটির সঙ্গে নূরের কথা হয়েছে এ কথা নূর সম্পূর্ণ চেপে গেলো।

মিঃ আহম্মদ যখন বললেন–মিঃ নূর, সেই বিস্ময়কর নারী আপনার বাসায় আমাকে সহ উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছে তাকে আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে হবে...

নূর একটু হেসে বললেন–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবেনা।

মিঃ নুর, আপনি কি করে এ কথা বলছেন? অবাক গলায় বললেন মিঃ আহম্মদ।

মিঃ সেলিমও প্রশ্নভরা চোখে তাকালো নূরের মুখের দিকে।

নূর বললো–আপনি যখন টেলিফোনে সেই নারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম এবং আপনার মুখে যখন জানলাম তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হলো সে নিশ্চয়ই গভীর রাতে আপনার এখানে আসবে

এবং সে কারণেই আমি আপনাকে না জানিয়েই গোপনে এসে পড়ি। আড়ালে থেকে আমি সব শুনেছি আপনি যা এখন আমাদের সামনে বললেন।

মিঃ নূর!

হাঁ, আমি তাকে ইচ্ছা করলে গ্রেপ্তার করতে পারতাম। কিন্তু গ্রেপ্তার না করে তার উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম মানে তার পথরোধ করে তার সব কথা যা আপনার সহযোগিতায় করতে চায় বা চেয়েছিলো আমি জেনে নিয়েছি।

মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ সেলিম এক সঙ্গে বলে উঠলেন–বলেন কি মিঃ নূর।

হাঁ, আপনাকে বিরক্ত করতে সে আর আসবেনা।

কি চায় সে?

উদ্দেশ্য মহৎ।

মানে? বললেন মিঃ সেলিম।

সেই নারীমূর্তি আমাকে বললো কিছু অর্থ সে কান্দাইয়ের দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়……সমস্ত কথা নূর বললো কিন্তু সে গোপন করলো ঐ কথা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে নারমূর্তি যা বলেছিলো।

পরদিন ব্যাপারটা কান্দাই পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো। অবাক হলো সবাই, সবার মুখেই ঐ একটি কথা পুলিশ সুপারের বাসায় এক অদ্ভুত নারী মূর্তির আবির্ভাব।

এ ব্যাপার নিয়ে কান্দাই প্রশাসনিক বিভাগে আলোচনা চললো। কে এই নারী যে হঠাৎ এ ভাবে আবির্ভূত হলো? তার উদ্দেশ্যই বা কি?

পুলিশ সুপারের বাস ভবনে, শুধু তাই নয় নারীটি মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলেছে।

কান্দাই জনগণ নূরকে ডিটেকটিভ হিসাবে ভীষণ মেনে চলতো এবং শ্রদ্ধা করতো। তবে অসৎ ব্যক্তিগণ ভয় পেতো তাকে, কারণ তরুণ ডিটেকটিভ কখন কোন ছদ্মবেশে কার পাশে গিয়ে হাজির হবে কেউ তা টের পাবে না বা পায় না।

ঘুষখোর, কালোবাজারী যারা তারা সবাই আজকাল আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সহসা কেউ কোনো অন্যায় করতে গেলে একটু ভীত হয়, ভাবে, কে জানে ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ মিঃ নূর তাকে লক্ষ্য করছেন কি না।

সত্য বলতে কি নূরের সূতীক্ষ্ণ নজরে কান্দাইয়ের দুর্নীতি কিছুটা লাঘব হয়েছে তবে একেবারে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের ব্যাপারে নূর কিছু করতে পারেনি, কারণ সব জেনেও তাকে নীরব থাকতে হয়েছে। যারা রক্ষক তারাই যদি ভক্ষক হয় তা হলে......

নূর তবু চেষ্টা চালিয়ে চলেছে যাতে দেশ দুর্নীতি মুক্ত হয়। কিন্তু সে জানে এটা তার একার পক্ষে সম্ভব নয় তবুও মনেপ্রাণে প্রচেষ্টার অন্ত নেই তার।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলো নূরের। চোখ মেলতেই দেখলো সেই জমকালো পোশাক পরা নারীমূর্তি তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

নূর বিস্ময় নিয়ে উঠে বসলো।

নারীমূর্তি বললো–আমার নাম রাণী তবে রাজরাণী নই। তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। ভাবছো কেমন করে এলাম? যেমন করে সেদিন মিঃ আহমদের বাসায় গিয়েছিলাম ঠিক সেই ভাবেই এসেছি। আমি তোমাকে অর্থ দিয়ে যাবো তা তুমি, বনহুরের সাহায্যে যারা বেঁচে আছে মানে ক্ষুধা নিবারণ করে যাচ্ছিলো তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিও। তারা যেন বুঝতে না পারে এ টাকা বনহুর দেয়নি।

নূর দ্রুত বালিশের তলা হতে রিভলভার বের করে উদ্যত করে ধরলো রাণীর বুকে। তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। দস্যু বনহুরের দয়ায় যারা বেঁচে আছে তাদের সাহায্য করতে আমাকে অর্থ দিয়ে যাবে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো রাণী।

নূর আরও অবাক হলো।

রাণী বললো–তুমি গুলি ছুড়লে আমি নিহত হবো না, কারণ তোমার রিভলভারে এখন গুলি নেই।

নূর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিভলভার পরীক্ষা করে দেখলো। সত্যি গুলি কখন কে বের করে নিয়েছে। শোবার সময় নূর প্রতিদিন রিভলভার ঠিকমত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে। আজও সে শোবার পূর্বে তার নিজস্ব রিভলভারখানা পরীক্ষা করে দেখে তারপর শয়ন করেছিলো কিন্তু এখন দেখছে রিভলভারে একটিও গুলি নেই। তা হলে কি নারীটি সে যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো তখন তার বালিশের তলা হতে রিভলভার বের করে নিয়ে গুলি সরিয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই তাই হবে, না হলে......

কি ভাবছো নূরুজ্জামান? যাক জবাব তোমার কাছে চাই না তোমার অবাক হবার কিছু নেই, কারণ তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমিই এ কাজ করেছি......

আমি তা বুঝতে পেরেছি! গম্ভীর কণ্ঠে বললো নূর। তারপর রিভলভার বিছানার একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো–বনহুরের সন্ধান তুমি কি করে জানলে?

তোমার বয়সের চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি, কাজেই অভিজ্ঞতায় আমি তোমার চেয়ে কম নই নূর। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে আমার সব জানা আছে যা তুমি বা তোমার মত আরও দশজন জানে না।

হাঁ, তোমার আচরণেই তা বুঝা যাচ্ছে। তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও আমার নাম জানো, আমার পরিচয় জানো, এমন কি আমার বাস ভবন চিনে নিয়েছ......

তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই ছিলো আমার মূল উদ্দেশ্য। এই নাও টাকা কথাটা বলে একটা ব্যাগ তুলে নিলো হাতে, এততক্ষণ এই ব্যাগ নূর লক্ষ্য করেনি, কারণ ব্যাগটা মেঝেতে খাটের আড়ালে ছিলো। ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বললো রাণী–এর মধ্যে বহু টাকা আছে, ইচ্ছামত তুমি বিলিয়ে দিও তাদের মধ্যে যারা বনহুরের অর্থে জীবনধারণ করতো। একটু থেমে বললো রাণীকান্দাই আমি প্রথম এসেছি, কাউকে চিনবার মত অবসর আমার হয়নি। আমি শুধু বিশ্বাস করি তোমাকে, তাই তোমার উপর এ দায়িত্ব দিলাম।

কে তুমি? সঠিক জবাব না দিলে আমি তোমাকে যেতে দেবো না। আর বলল বনহুরের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? বলল, না বললে তোমাকে...... পথরোধ করে দাঁড়ায় নূর।

রাণীর মুখ ঢাকা, কাজেই তার মুখমন্ডল নূর দেখতে পাচ্ছে না। ঘরে ডিমলাইট জ্বলছে। ডিমলাইটের আলোতে রাণীর দেহের পোশাক চক চক করছিলো।

রাণী বললো–আবার যখন দেখা হবে তখন আমার পরিচয় তুমি পাবে। ইচ্ছা ছিল আর কয়দিন কান্দাই থেকে যাবে কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দেবো না, গ্রেপ্তার করবো।

সম্ভব নয় তোমার পক্ষে, কারণ তোমার বাসায় কেউ এখন তোমার ডাকে সাড়া দেবে না, দ্বিতীয়তঃ তোমার টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কোথাও ফোন করতে পারবে না। বরং আমার লোক এখন তোমার বাসার সামনে পুলিশগার্ডের বেশে অপেক্ষা করছে।

নূরের দুচোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

রাণী বলে তুমি আমার কথা রেখো। বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো রাণী।

নূর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে।

নিচে এসে কাউকে সে দেখতে পেলো না।

বয় বাবুর্চি সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, এমন কি গেটে দারোয়ানটিও ঘুমাচ্ছে।

নূর ফিরে এলো নিজের কক্ষে।

রাণীর রেখে যাওয়া ব্যাগটা খুলে ফেললো। হাজার হাজার টাকার বাণ্ডিল থরে থরে সাজানো। নূর অন্যমনস্ক হয়ে গেলো, এতো টাকা...গরীবদের জন্য...তাকে রাণী বিশ্বাস করে এত টাকা দিয়ে গেলো...কিন্তু কে এই নারী...এর সঙ্গে আব্বুর কি সম্পর্ক...তবে কি আব্বু এই নারীকে...না না, তার আব্বু দস্যু সম্রাট হতে পারে কিন্তু পাপ সে করতে পারে না...এ নারী তবে

নূর ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো। তার চারপাশে দেওয়ালগুলো বলছে–না না, তার আব্বু পবিত্র, তাকে অবিশ্বাস করা যায় না। তবে এ নারীর সঙ্গে তার আর কি সম্পর্ক নূর ব্যাগটা খুলে আবার টাকাগুলো দেখলো, এ যেন এক বিস্ময়।

*

হামবার্ড তার বিশিষ্ট অনুচর রেহাৎ খানকে বললো–রেহাৎ।

বলল মালিক? রেহাৎ খান তার কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো–যেমন হামবার্ডের চেহারা, তেমনি ভীষণ চেহারা রেহাৎ খানের। অসুরের মত বলা যায়।

হামবার্ড আর রেহাৎ খানের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। সামনে বাইনোকুলার মেশিন, সুইচ টিপেলেই সমুদ্রের তলভাগ দেখা যায়। হাঙ্গর, বৃহৎ আকার কচ্ছপ, বিচিত্র ধরনের মস এবং নানা ধরনের পাহাড় ও উদ্ভিদ। পাশে, আরও কয়েকটি মেশিন ও সুইচ রয়েছে। একটি সুইচে চাপ দিতেই সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো যে ক্যাবিনে বনহুর গভীর নিদ্রায় মগ্ন সেই ক্যাবিন। শয্যায় শয়ন করে আছে বনহুর।

এখনও সে নিদ্রামগ্ন।

হামবার্ড বললো–রেহাৎ, জানো তো একে দিয়ে আমরা অনেক কঠিন কাজ সমাধা করতে পারবো। যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

জানি মালিক। আরও জানি...

বলো, থামলে কেন?

বনহুর দস্যু হলেও সে অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না। সহজে তাকে বশে আনা সম্ভব হবে কি মালিক

বশে আসতে না চাইলেও তাকে বশে আনতে হবে রেহাৎ।

তাকে বশে আনতে যা প্রয়োজন তাই করতে হবে....হামবার্ড এতোক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তার সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায়। বনহুর শয্যায় ঘুমিয়ে আছে এবার সে পাশ ফিরলো। মুখটা ওর স্পষ্ট নজরে পড়ছে এবার। হামবার্ড বললো–অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর ঘুম ভেঙে যাবে। তুমি ওর ক্যাবিনে খাবার পাঠিয়ে দাও। বনহুর ফল খেতে ভালবাসে, কাজেই ফল দিও বেশি করে।

আচ্ছা মালিক? রেহাৎ খান বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

হামবার্ড বললো–শোন।

বলো মালিক?

ওর যা প্রয়োজন তাই দেবে।

আচ্ছা।

খাবারগুলো মিস্ ইলোরাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। আমি চাই মিস্ ইলোরার দ্বারা বনহুরকে বশে আনতে।

তাই ভাল মালিক। আমি এক্ষুণি মিস্ ইলোরাকে তৈরি হতে বলছি। কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো রেহাৎ খান।

হামবার্ড সুইচ অফ করে উঠে পড়লো।

এসে দাঁড়ালো বিপরীত এক ক্যাবিনে। যেখান থেকে দেখা যায় সমুদ্রের উপরিভাগ। কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ আসছে কিনা। তার পাশে আরও দুজন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হামবার্ডের নির্দেশের অপেক্ষায়।

*

বনহুর শয্যায় উঠে বসতেই তার দৃষ্টি পড়লো মেঝেতে।

দুখানি সুন্দর কোমল চরণ। ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলে ধরলো বনহুর। সুন্দরী এক তরুণী এক পাত্র ফলমূল নিয়ে দন্ডায়মান তার শয্যার পাশে। অবাক হলো বনহুর, সমুদ্র গর্ভে ডুবু জাহাজে তরুণী……বিস্ময়ভরা বনহুরের দুটি চোখ।

তরুণীর শরীরে নর্তকীর ড্রেস।

চোখে মুখে অসহায় করুণ চাহনি।

বনহুকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তরুণী বিব্রতবোধ করছিলো তার চোখে মুখে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো সেই ভাব ধারা।

মৃদু হেসে বললো বনহুর হামবার্ড শুধু জলদসই নয় ডুবু জাহাজে সে অনেক কীর্তিই করে।

ওদিকে তখন হামবার্ড টেলিভিশন পর্দার পাশে বসে সব লক্ষ্য করছিলো। তারপাশে রেহাৎ খান দন্ডায়মান।

বনহুর যখন তরুণী ইলোরার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলো তখন বেশ আনন্দ বোধ করছিলো হামবার্ড। কারণ সে চায় ইলোরার দ্বারা বনহুরকে বশীভূত করতে। বনহুর যেন ভুলে যায় তার অতীত জীবন.....

বনহুরের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই রেহাৎখান বললো—-মালিক বনহুর বড় ধূর্ত, সে সহজে বশে আসবে বলে মনে হয় না।

কঠিন কণ্ঠে বলল হামবার্ড যেমন করে থোক ওকে আয়ত্তে আনতে হবে। দস্যুরাণী সাগর বক্ষ হতে বনহুরকে দিয়ে নীলমনি মাণিক উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আমি চাই বনহুকে দিয়ে নীলমনি মাণিক পুনরায় দস্যুরাণীর কবল থেকে আমার হাতে আনতে।

রেহাৎ বললো–মালিক, তুমি ইচ্ছা করলে নিজেও পারতে এ মাণিক উদ্ধার করে আনতে।

জানোনা রেহাৎ, দস্যুরাণী কতখানি চালাক নারী! তার কবল থেকে সাধ্য নেই আমি বা আমার অনুচরগণ এই নীরমনি মাণিক উদ্ধার করে আনি। ঐ দস্যুরাণী আমাকে.....থাক সে সব কথা।

মালিক, দস্যুরাণী তোমাকে কয়েকবার নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে সব আমরা জানি।

জানো তবে পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। বনহুরকে রাণী যথেষ্ট সমীহ করে, কাজেই তার দ্বারা ঐ মহামূল্য সম্পদ আমি হস্তগত করবো।

মালিক বনহুর নিজেও তো ঐ সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারতো?

পারতো কিন্তু....ঐ মুহূর্তে বনহুরকে টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পাচ্ছে, ইলোরার হাত থেকে ফলের পাত্রটি নিয়ে বনহুর বিছানার পাশে রাখলো।

হামবার্ড উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের টেলিভিশন পর্দায়।

বললো বনহুর–তুমি ছাড়া এই ক্যাবিনে খাবার দেবার কি আর কেউ ছিলোনা?

মিস ইলোরা নীরব।

বনহুর বললো–এ জাহাজে তুমি এলে কেমন করে?

নিরুত্তর তরুণী।

হামবার্ড আর রেহাৎখান বুঝতে পারে ইলোরা জানে সে কোনো কথা বলতে পারবেনা, কারণ তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কোনো তথ্য প্রকাশ না করা হয়। তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে। বনহুরকে ভুলিয়ে তাকে হামবার্ডের বশীভূত করা।

এবার বনহুর বললো–কথা বলতে পারো না?

তবু নীরব ইলোরা।

এবার বনহুর বললো–এই ফলগুলো কার জন্য এনেছো?

আপনার জন্য।

এই তো সুন্দর কথা বলতে পারো? তবে এতক্ষণ যা জিজ্ঞাসা করলাম জবাব দিচ্ছো না কেন?

আবার সে নীরব হয়ে গেলো।

এবার বনহুর বুঝতে পারলে তাকে কোনো কথা বলতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। বনহুর ফল তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

তরুণীর দুচোখে খুশি ভাব পরিলক্ষিত হলো।

বনহুরের দৃষ্টি এড়ালো না, তরুণী তাকে খেতে দেখে খুশি হয়েছে। যা হোক তার হিতাকাংখী তা হলে তরুণী–বনহুর ওর দিকে চেয়ে হেসে বললো–জানিনা

তুমি কে? এখানেই বা এলে কি করে? কি তোমার পরিচয় বা তোমার নাম তাও জানিনা। জানি তুমি আমার একজন সাথী.....

জলদস্যু হামবার্ডের মুখেও হাসি ফুটে উঠলো, বললো সে–রেহাৎ ঔষধ ধরেছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ মালিক হাসলো রেহাৎ।

দুটি নর পশুরই মুখে আনন্দোচ্ছাস।

বনহুর বলে তোমার নাম বলতেও কি আপত্তি আছে?

বললো তরুণী– না। আমার নাম ইলোরা।

খেতে খেতে বললো বনহুর–আমি তোমাকে ইলো বলেই ডাকবো।

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো তরুণী।

বনহুর ফল ভালবাসে তাই সে ফল খেলো যা তার মন চাইলো।

তরুণী স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। পৌরুষদীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ সে মুখ। ইলোরা এখানে বহু পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন সুন্দর সুপুরুষ দেখেনি। ইলোরা মুগ্ধ হয়েছে!

হামবার্ড ও রেহাৎ খানও বনহুরের সৌন্দর্যে অভিভূত। তারা ইচ্ছা করলেও সহসা যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। বনহুর যখন ইলোরার সঙ্গে কথা বলছিলো তখন তারা বিপুল আগ্রহ নিয়ে দেখছিলো।

কিন্তু বনহুর ইলোরাকে বলে বসলো–এবার তুমি যেতে পারো।

বললো ইলোরা–তবে যাই?

ফলের ঝুড়ি নিয়ে যাও।

বেরিয়ে গেলো ইলোরা ফলের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে।

বনহুর উঠে গিয়ে দাঁড়ালো কাঁচের শার্শীর পাশে। হাত দিয়ে ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে সাগর তলের দৃশ্যগুলো ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। নানা ধরণের জলীয় উদ্ভিদ। কত রকম মৎস্য, সম্পূর্ণ একটি তারার মত। বিরাট একটি অদ্ভুতজীব হয়তো বা নতুন কোনো মৎস্য হবে। একটি হাঙ্গর এগিয়ে আসতেই অন্যান্য জীবগুলো টিলা আর জলীয় সামুদ্রিক ঝোঁপ ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

সমুদ্রের গভীর তলদেশে ডুবু জাহাজের গহ্বরে দাঁড়িয়ে বনহুর দেখছিলো সামুদ্রিক জীবগণের লুকোচুরি খেলা। প্রাণ ভয়ে কোন জীব পালাচ্ছে আবার কোন জীব ধাওয়া করছে তাকে ধরে খেতে। কত রংবে রং–এর জলীয় উদ্ভিদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রবিস্ময়কর জীব, নানা বর্ণ তাদের। অবাক হয়ে বনহুর দেখছিলো।

এমন সময় তার কাঁধে কেউ হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

জলদস্যু হামবার্ড।

মুখে তার শয়তানী হাসি।

বললো–কি ভাবছো?

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলো সমুদ্রের তলদেশে অদ্ভুত আর বিচিত্রময় জীবগুলোর দিকে। যদিও এসব বনহুরের কাছে নতুন নয় তবুও ভাল লাগছিলো, মুক্ত ওরা, খেলা করছে আপন মনে।

কি ভাবছো বনহুর। ঐ জলজীবগুলোর মত সাঁতার কাটতে চাও? আমি তোমার জন্য সেই ব্যবস্থাই করবো।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে ফিরে এলো শয্যায়।

বসলো শয্যার ওপরে।

হামবার্ড একটি আসন টেনে নিয়ে বসলো, যেন সে মহারাজ। কারণ তেমনি ভাবেই সে আসনে বসেছে। অবশ্য জলদস্যু হিসাবে তাকে সমুদ্রের রাজাই বলা

যায়।

বললো হামবার্ড–বহু দিনের আশা তোমাকে আমি আমার প্রধান সহচর করে নেব।

হাসলো বনহুর।

হামবার্ড বলে চলেছে–যা চাও তাই পাবে। আমি জানি তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারো। দস্যুরাণীর নীলমনি মাণিক যা কোনো রাজা মহারাজার নেই তা তুমি গভীর সাগর তল থেকে উদ্ধার করে তাকে দিয়েছো। লোভ–লালসা তোমার নেই তাও জানি। লোহ–লালসা থাকলে তুমি এ সম্পদ হাত ছাড়া করতে না।

বনহুর তবু নীরব।

হামবার্ড বলে চলেছে–বনহুর, এমন কোনো জিনিস নেই যা তুমি পাবে না। যা যখন চাইবে। তাই পাবে।

বনহুর তাকালো হামবার্ডের মুখের দিকে। নীল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ।

তখনও বলে চলেছে হামবার্ড–আমার ডুবু জাহাজে যা চাইবে তাই পাবে। ধন–রত্ন, মনি মাণিক, ছাড়াও আছে অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। এরা সর্বক্ষণ তোমাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করবে……

হামবার্ড এর বেশি আমি আর শুনতে চাইনা! কঠিন আর গদাম্ভীর বনহুরের কণ্ঠস্বর।

বললো হামবার্ড–জানি তোমার বুদ্ধি আছে কিন্তু শুধু তুমি গরিব আর দুঃখীদের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দাও।

তুমি কি বলতে চাও হামবার্ডঃ

তোমাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করবো কিন্তু একটি কাজ করে দিতে হবে। সে কাজ হলো দস্যুরাণীর সেই নীলমনি মাণিক যা তুমি সাগর তল থেকে রাণীকে উদ্ধার করে এনে দিয়েছিলে……

অসম্ভব।

কেন?

দস্যু হলেও আমার নীতিবোধ আছে।

তোমাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি.....তোমাকে আমি অবধারিত মৃত্যু হতে রক্ষা করেছি। কৌশলে আমার ডুবু জাহাজে তোমাকে নিয়ে এসেছি কিসের জন্য–শুধু নীলমনি মাণিক–এর জন্য......ওটা তুমি ছাড়া কেউ রাণীর কাছ থেকে এনে দিতে পারবেনা জানি?

আমাকে উত্তেজিত করো না হামবার্ড....

জানি তুমি ভয়ংকর কিন্তু.......এখন তুমি আমার হাতের মুঠায়–হাঃ হাঃ হাঃ আমি মানব নই দানব।

তা আমি জানি হামবার্ড।

জানো! তাহলে ও কথা বলতে না। যা এখন বিশ্রাম করো, আবার আসবো।

বনহুর কোনো জবাব দেয়না।

হামবার্ড বেরিয়ে যায়।

বনহুর পুনরায় এসে দাঁড়ায় সেই গোলাকার কাঁচ সংযুক্ত ছিদ্র পথের পাশে। যে পথে সমুদ্রের তলদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বৈচিত্রময় সেই দৃশ্য বনহুর যত দেখে তত অবাক হয়। তার সঙ্গে খেলা করে চিন্তাধারা। হামবার্ড শুধু জলদস্যুই নয় সে একটি নর পশু, একটি ভয়ংকর জীব। কত নিরীহ মানুষকে সে হত্যা করেছে কত তরুণীকে সে হরণ করেছে। লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের পাপ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য...... আপন মনে ঠোঁট কামড়ায় বনহুর।

*

জাভেদ তার অশ্ব জাম্বুর পৃষ্ঠে উল্কা বেশে ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছে সে জানেনা। যেখানে ক্ষুধা পায় অশ্ব থেকে নেমে সে যা পায় তাই সে খায়। ফল–মূল, কাঁচা মাংস কিছুই তার বাদ যায়নি। সবই তার খাদ্য।

যেখানে রাত হয় সেখানে জাম্বুকে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

জাম্বু শুধু অশ্বই নয় সে জাভেদের দেহরক্ষীও বটে।

জাভেদ যেখানে ঘুমায় শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে জাম্বু। এমন কোনো জীব নেই যে জাম্বুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসে। হিংস্র জীবজন্তু জাম্বুকে ভয় পায়। জাভেদ এ কারণে নিশ্চিতে ঘুমায়।

জাভেদের হাতে শিকল মুক্ত হলেও তার ডান হাতের কজায় শিকলের আধখানা এখনও ঝুলেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে ওটা হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

গহন বনে বাস করে জাভেদ।

বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

সে গিয়েছিলো সেই জ্যোতিষীর বাড়িতে কিন্তু খুঁজে পায়নি হুমায়রাকে। তাই জাভেদ আর সেখানে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এসেছে। অশ্ব জাম্বু এখন তার একমাত্র সাথী। সে নিজেই জানেনা কে সে, কি তার পরিচয়।

জাভেদ এখন বন্য জন্তুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় বাঘ ভল্লুক সিংহকেও সে ভয় পায়না। এরা জাভেদকে ভয় পায় কারণ জাভেদ দিন দিন হিংস্র জীবজন্তুর চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

জাভেদ সেদিন বনহুরের পাশ থেকে যখন সরে পড়েছিলো তখন ছিলো গভীর রাত। বনহুর ক্লান্ত অবসন্ন দেওহ ঘুমাচ্ছিলো। সমুদ্রের গর্জন তার ঘুমের বেঘাৎ ঘটাতে পারেনি।

নিদ্রা ভেঙে গিয়েছিলো জাভেদের। সে তাকিয়ে দেখছিলো পাশে শুয়ে আছে সেই ব্যক্তি যে তাকে সমুদ্র হতে তুলে এনেছে। লোকটার কি উদ্দেশ্য, তাকে উদ্ধার করে তার দ্বারা আবার কোনো কাজ করিয়ে নিতে চায়, যেমন জ্যোতিষী সন্ন্যাসী তাকে দিয়ে একটি মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে নিয়েছিলো শুধু তাই নয় তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। ভাগ্যিস্ সে বেঁচে গেছে। জাভেদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো একটির পর একটি বিপদের প্রতিচ্ছবি। ইংরেজ বণিকরা তাকে কি ভাবে ফাঁদ পেতে ধরেছিলো তারপর তার উপরে চালিয়ে ছিলো নানা রকম অকথ্য অত্যাচার। হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে তাকে খাঁচায় ভরে রেখেছিলো। তাকে পশুর মতো বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলো কোথায় কে জানে।

সেদিনের কথা জাভেদকে উদ্বিগ্ন ভীত চঞ্চল করে তোলে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে জাভেদ, দাউ দাউ করে তার চারপাশে আগুন। ইংরেজ বণিক আর নিগ্রোদের ছুটোছুটি, জাহাজখানা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। কে একজন আগিয়ে আসে তার দিকে। তাকে শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় কাঁধে তুলে নেয় একজন, সে তারই পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে জাভেদ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না......সে পালিয়ে যায় ঘুমন্ত বনহুরকে দেখে। আজ জাভেদ আশ্রয় হারা, স্বাভাবিক জ্ঞান শূন্য বলা যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে সে শিউরে উঠে, চিৎকার করে উঠে সে ভয়ে। ওর মনে হয়, আবার কেউ বা কারা তাকে ধরতে চায়, বন্দী করতে চায়, তাই সে দূরে আরও গহন বনে চলে আসে। তার এক মাত্র সঙ্গী জাম্বু তার প্রিয় অশ্ব।

জাভেদের পরনে প্যান্ট ছিলো তা ছিঁড়ে গেছে, তাই সে আজকাল হরিণ বা বাঘের চামড়া পরে। মাথার চুল বেশ লম্বা হয়ে এসেছে। শরীর সম্পূর্ণ আলগা জামা–কাপড় বিহীন।

জাম্বুর পিঠে চেপে সে সমস্ত বন চষে ফেরে। তার একমাত্র অস্ত্র তার দুটি বাহু। গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে সে হরিণ শিকার করে। বাঘ ভল্লুক এবং তার চেয়েও যে সব হিংস্র জীবজন্তু তাকে আক্রমণ করে, তাদের সে ঘায়েল করে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে।

হঠাৎ যদি কোনো শিকারী বনে পশু শিকারে আসে তখন তাদের দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে যায় সে। মানুষ দেখলে সে পালিয়ে বেড়ায়, ক্ষতিসাধন সে কারও করে না।

কিন্তু শিকারীগণ বিস্মিত হয়।

গভীর বনে মানুষ দেখে তাদের মনে জাগে নানা প্রশ্ন।

শিকারীগণ শহরে ফিরে একথা সাংবাদিকগণকে বলেন তারা স্থানীয় সংবাদপত্রে নানাভাবে এ সংবাদ পরিবেশন করে।

একদিন এই সংবাদপত্র কোনক্রমে কান্দাই গিয়ে পৌঁছে।

কান্দাই সংবাদপত্র এ কথা ফলাও করে প্রকাশ করে।

এই সংবাদপত্রে সংবাদটি অনেক কে বিস্মিত করে তোলে। নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। কে এই তরুণ যাকে গভীর বনে দেখা যায়। অনেকেই তাকে কাঁচা মাংস খেতে দেখেছে। বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যি জাভেদ আজ স্বাভাবিক জ্ঞান শূন্য। সে শুধু স্মরণ করতে পারে জ্যোতিষী সন্ন্যাসীর কুঠির আর হুমায়রাকে। তার স্বভাব দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে। খালি হাতে সে বাঘ বা সিংহের সঙ্গে লড়াই করে; কত বাঘকে জাভেদ আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছে।

এক বনে বা এক স্থানে তাকে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না। বনে বনে তার বিচরণ, অসম্ভবকে জাভেদ সম্ভব করে নেয়। সব বিস্মিত হলেও জাভেদের কাছে দয়ামায়া, সে জাম্বুকে ভালবাসে প্রাণ অপেক্ষা।

জাভেদের পরিচয় কেউ জানে না, তাকে কেউ কোনোদিন লোকালয়ে দেখতে পায় না অথচ তাকে দেখবার জন্য অনেকের সখ।

*

আশা হুমায়রাকে নিজ কন্যার মত আদর যত্ন করে। কিন্তু ঐ কুটিরে কারো প্রবেশের ক্ষমতা নেই, যে কুটিরে রয়েছে ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ মুখ। এমন কি হুমায়রাও না।

শুভ্র বসন পরিহিতা আশা যখন সেই কুটির হতে বেরিয়ে আসে তখন হুমায়রা বিস্ময় ভরা নয়নে তাকিয়ে থাকে মানবী না দেবী। সত্যি তাকে অপূর্ব দেখায়।

আশাকে হুমায়রা যে ভাবে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিতে দেখে তাতে সে ভীষণ অবাক হয়। গভীর জঙ্গলে ভীড় জমে দীন হীন কাঙ্গালের দলের।

এমনভাবে হুমায়রা কাউকে বিলিয়ে দিতে দেখেনি।

টাকা কড়ি স্বর্ণ যা যখন ইচ্ছা হয় বিলিয়ে দেয় আশা নিজ হাতে।

হুমায়রা কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়, বয়স তার খুব বেশি না হলেও সব সে বোঝ! এখানে তার বেশ ভালো লাগছে। জ্যেতিষী বাবার কাছে সে বহু দিন কাটিয়েছে সেখানে মাঝে মধ্যে অস্বস্তি বোধ করতো, এখানে আসার পর আশাকে

বড় বোনের মত মনে করে। আশাও ছোট বোনের স্নেহে আদর–যত্ন করে থাকে, তাই হুমায়রা যেন সব দুঃখ ব্যথা ভুলে নিজকে নতুন মানুষ হিসেবে ভাবতে পারে। শুধু যে একটা দুঃখ মনে গভীর ভাবে অনুভব করে সে হলো তার ইন্দ্রনাথ।

মাঝে মাঝে হুমায়রা নির্জনে বসে ভাবে সত্যি কি যে আর ফিরে আসবেনা। ঐ মুখখানা তার মানসপটে আঁকা–হয়ে রয়েছে। বড় আশা করেছিলো হুমায়রা ইন্দ্রনাথকে সে পাবে কিন্তু কোথায় সে হারিয়ে গেলো কে জানে।

আশা কিন্তু হুমায়রার এই ভাবাপন্ন ভাব লক্ষ্য করতো। ভাবতো মেয়েটি বুঝি। আপনজন ভাবতে পারছে না তাই সে এসে বসতো তার পাশে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে কি ভাবছে হুমায়রা?

হুমায়রা কথা বলতোনা।

হয়তো বা দুচোখ তার ভরে আসতো কান্নায়।

আশা ভাবতে হয়তো নতুন পরিবেশ তাকে উদাসীন করে তুলেছে। তাই সে মাঝে মধ্যে নিয়ে দূরে কোথাও কোনো ঝরণার পাশে গিয়ে বসতো।

হয়তো বা কোনোদিন পর্বতমালার পাদমূলে নতুন নতুন গুহা আবিষ্কার করে দেখাতে।

হুমায়রাকে ভোলাতে গিয়ে নিজে আশা আনমনা হয়ে যেতো, তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো বনহুরের মুখ। আশা যার জন্য আজ ত্যাগ করেছে সব কিছু। সেই মানুষটির জন্য ভাবতো।

চালাক মেয়ে হুমায়রা বুঝতে পারতো তার আশা আপু কেন এমন আনমনা হয়ে যায়। কেন তাকে মাঝে মাঝে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখে।

তবে হুমায়রার সামনে আশা কোনো সময় চোখের পানি ফেলেনি। নিজকে সে সংযত করে রেখেছে অতি কষ্টে।

আশা যেন হুমায়রাকে স্বাভাবিক রাখতে চায়, বুঝতে চেষ্টা করে ওর মনকে। তেমনি হুমায়রাও আশার মন বুঝবার জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করে। ভাবে হুমায়রা বনহুরের কথা, বনহুর যেদিন তাকে নিয়ে এই নির্জন স্থানে এলো, তখন

আশার দুচোখে সে দেখেছিলো সীমাহীন আনন্দ। সে খুশির উচ্ছ্বাস আর কোনোদিন হুমায়রা আশার মধ্যে দেখতে পায়নি। আবার যখন বনহুর হুমায়রাকে আশার হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলো, তখন সে দেখেছিলো একরাশ ব্যথা বুক চিরে অশ্রু হয়ে আশার দুচোখে নেমে আসতে। সব বোঝে হুমায়রা, তবু তার মন আরও জানতে চায়।

সেদিন হুমায়রা বসেছিলো নির্জনে। দুচোখে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।

আশা কুটিরে হুমায়রাকে না পেয়ে অস্থিরচিত্ত নিয়ে সন্ধান করতে গিয়ে খুঁজে পেলো তাকে কুটিরের অদূরে। একা বসে আছে।

হুমায়রা নিশ্চুপ।

বললো আশা–হুমা, এখানে কেন বসে আছ?

হুমায়রা কোনো জবাব দিলো না।

আশা ওর মুখখানা দক্ষিণ হাতে ফিরিয়ে নিতেই দেখতে পেলো দুচোখে তার পানি। অবাক কণ্ঠে বললো আশা–হুঁমা, তুমি কাঁদছো?

আশা হুমায়রাকে মা বলে ডাকে, ঐ নামটা নাকি আশার ভাল লাগে তাই। আশার কথায় হুমায়রা তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে ফেললো।

আশা বললো–জানি এখানে তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে কারণ বড় একা লাগছে।

না।

তবে কাঁদছিলো কেনো?

জানি না।

আশা ওকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে–আমার কাছে কিছু লুকোবিনা বোন। সবার মনেই ব্যথা থাকে বা আছে তাই বলে একেবারে মন মরা হয়ে থাকলে চলবেনা। জানিস হুমায় আমার মনে কত ব্যথা।

হুমায়রা চোখ দুটো তুলে ধরলো আশার মুখের দিকে। ঐ মুখখানা সত্যি এক গভীর ব্যথা কাতর মুখ। হুমায়রা এবার বলে–এখানে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আছো আমার পাশে……।

হুমা একদিন তোকে আমি শোনাবো একটি কাহিনী।

কেন, আজ বলতে পারো না?

শুনবে? শুনবে আমার জীবনের ঘটনার একটি পাতা

শুনবো, বল?

হুমায়রা নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো আশার মুখের দিকে।

আশা উদাসীন চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে হয়তো অতীতের প্রতিচ্ছবি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে বলে–একদিন আমি শিকার করতে বেরিয়েছি শুধু আমার সঙ্গী আমার অশ্বটি। কাউকে আমি সঙ্গে নেই নাই। গহন বনে তীর ধনু নিয়ে চলেছি। দূরে বহু দূরে চলে এসেছি, হঠাৎ আমার কানে এলো অশ্ব খুরের শব্দ। আমি আমার অশ্ব নিয়ে একটা ঝোঁপের মধ্যে আত্মগোপন করলাম। আড়ালে লুকিয়ে দেখলাম জমকালো ড্রেস পরিহিত এক ব্যক্তি। অশ্ব থেকে নামলো, আশ্চর্য–তার অশ্বের কোন লাগাম ছিলো না। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে সে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসলো। আমি তাকে প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে হুমায়রা আশার মুখের দিকে।

আশার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক স্বর্গীয় আভা।

বলে চলেছে আশা–জানিনা ওকে সেদিন কেন আমি ভালবেসে ফেললাম ওর অজ্ঞাতে। একটু থামলো আশা, তারপর বলতে শুরু করলো–পুরুষ জাতাঁকে আমি ভাল নজরে দেখতাম না। কারণ পুরুষের কাছে আমি পেয়েছি শুধু কঠিন ব্যবহার। লোভ লালসা আর পাওয়ার বাসনা, তাই মন আমার বিষিয়ে উঠেছিলো, কিন্তু ওকে দেখবার পর আমার মন থেকে মুছে গেলো সেই ঘৃণা আর অস্থিরতা। তারপর অনেক সাধনার পর ওকে কাছে পেলাম–সত্যি সেদিন আমার মন পুরুষ জাতীর উপর শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো। লোভ–লালসা, কুৎসিৎ বাসনা সবার মধ্যেই

নেই। কত মন, আছে যা পবিত্রতায় ভরা। হুমায়রা সে পুরুষ বনহুর.......সত্যি অপূর্ব ওর চরিত্র ...আমি ওকে ভালবাসি......।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা পানি।

হুমায়রা বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

*

নূর কাপড় বিক্রেতার ছদ্মবেশে রাণীর দেওয়া টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বস্তি এলাকা, গরিব সাঁওতাল পল্লী, দীনহীন কৃষকের বাড়ি সব জায়গায় সে সন্ধান করে ফিরলো কারা বনহুরের সাহায্যে নিয়ে জীবন কাটায়। কি ধরনের মানুষ তারা, সত্যি কি তারা সাহায্য পাওয়ার উপযোগী।

বস্তি এলাকার মানুষগুলোর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে নূর ব্যথিত হলো। কারণ তারা কি ভাবে যে এইসব এলাকায় বসবাস করে তা কল্পনা করা যায় না। বর্ষার দিনে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে, কুটিরের বাইরে এক হাটু কাদা। ছোট ছোট চালা ঘরে ঝুপঝাঁপ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে। এক একটা বস্তি এলাকায় বাস করে প্রায় হাজার হাজার মানুষ, তারা দিন আনে দিন খায়।

মেয়েদের পরনে জীর্ণব তাও দুর্গন্ধময়।

কেউ কেউ লজ্জা নিবারণে কুটিরের বাইরে বের হতে পারে না। কতকগুলো উলঙ্গ ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় কাঁদছে। কোথাও অসুস্থ বৃদ্ধ বিনা ঔষধে মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গুণছে।

নূর ভাবে শহরে চাকচিক্যের আলো বাতাস থেকে এরা কত দূরে। এরাও তো মানুষ কিন্তু এরা পশুর চেয়েও অধম। এদের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। কেউ এদের ব্যথা বুঝতে চায় না বা বুঝবার চেষ্টা করে না। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ঐশ্বর্যবান যারা তারা আরও আকাশ চুম্বি ঐশ্বর্যের সাধনায় নিমগ্ন ব্যবসা–বাণিজ্যে কালোবাজারী করে মুনাফা লুটছে। যারা গদিতে আছেন, তারা একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য পদলাভ করেছেন কাজেই এই তত সময়।

তারা সারাজীবনের ইন্ধন জুটিয়ে নিচ্ছেন, গদিচ্যুত হলে যেন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে না হয়। ব্যাংক ব্যালেঞ্চ নিয়ে তারা মহা চিন্তাগ্রস্থ। স্ত্রী পুত্রদের নামে শহরে

ইমারৎ গড়ে আরও অর্থ বাড়ানোর চেষ্টায় ভাড়া দিয়ে নিজেরা জনসেবায় আত্ম নিয়োগ করেছেন–মানে সরকারকে খুশি করবার জন্য মাঠে ঘাটে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাহু নাড়িয়ে গদ গদ কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে রুমালে চোখের পানি মুছছেন।

কিন্তু এই মুখোশধারী সাধুবেশীদের সময় বেশি দূরে নয়। এই নিরন্ন মানুষগুলো ক্ষুধার জ্বালায় হিংস্র বাঘের চেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠছে দিন দিন। কান্দাই সরকার চান জনগণ বাঁচুক। ক্ষুধার জ্বালায় যেন কেউ না মরে কিন্তু সরকার চাইলে কি হবে? কান্দাই এর লোভাতুর কিছু সংখ্যক মানুষ শুষে নিচ্ছে কান্দাইয়ের সমস্ত রসগুলো।

তাই মানুষনামী জীবে পরিণত হয়েছে কান্দাইয়ের এই সব মানুষগুলো......কি ভাবে এরা বেঁচে আছে, নেই সচ্ছ পানি, নেই শুকনো মাটি, নেই পেটে ভাত বা রুটি, নেই পরনে কাপড়।

নূর ভাবছিলো আর চলছিলো। এক পা কাদা তবু সে চলেছে, জানতে হবে এদের কথা, এদের ব্যাথা এদের দুঃখ। এদের মধ্যে না এলে বোঝা যাবে না কিছু। একটু হাসে নূর, চিরকাল সে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া করেছে আরও উন্নত দেশে। সত্যি এমন জায়গায় সে তো কোনদিন আসেনি। বাসা থেকে বেরুতেই গাড়ি বারান্দায়, তারপর অফিসে প্রবেশ পথেও ধুলোবালি বা কাদার বালাই নাই। অফিসে ঘূর্ণিয়মান চেয়ার, মেঝেতে ভেলভেটের গালিচা বিছানো। নুর নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে, মনে মনে বলে আম্মি, দেখে যাও তোমার ছেলের পা দুখানা। দেখলে তুমি মাথায় করাঘাত করবে আর এরা যারা দিনের পর দিন এই কাদার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে......থমকে দাঁড়ালো নূর, একটি বৃদ্ধা পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো বললো নূর এই শোন...

বৃদ্ধা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো, তারপর রাগত কণ্ঠে বললো–কাপড় নেবো না চলে যাও।

নূর বললো–শোন!

বৃদ্ধা আবার খেঁকিয়ে উঠলো–টাকা নাই মাগনা দেবে।

বললো নূর–দেব শোন।

বৃদ্ধা এবার এগিয়ে এলো। নূরের কথা সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না তবু তার মনে একটা কৌতূহল উঁকি মারছে। বললো–মাগনা কাপড় দেবে?

হ দেবো। তোমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, ময়লা তারপর ভিজে জজপ করছে। অসুখ করবে না তোমার?

তুমি ছোঁড়া চালাক বড়। আমাকে ভুলিয়ে কাপড় বিক্রি করতে চাও। নেবো না যাও।

কেন নেবে না বুড়ি মা?

পয়সা নেই! পেটে ভাত নেই, চাল কিনতে পারছি না কাপড় নেবো।

কেন কেউ কি উপার্জনের নেই তোমার?

ছিলো এক বেটা।

কি হয়েছে তার?

বৃদ্ধার দুচোখ ছাপিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তবু সে বলে কারণ নূরের গলায় সে অজানা কোন কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। বলে ছেলেটাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখালাম। কিন্তু কোথাও চাকরি বাকরি পেলো না। ঘরে পয়সা নাই তাই দিয়ে ব্যবসা করাবো তাই ঠেলাগাড়ি চালাতো......আঁচলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে যা কামাই করতো এক বেলা আধা বেলা চলতো কিন্তু একদিন গেলো আর সে ফিরে এলো না। সারা দিন এলোনা সন্ধ্যা হলো, রাত হলো এক সময় ঐ ও বাড়িতে বরকত আমার ছেলেকে কাঁধে করে ফিরে এলো আমার মাণিক বেঁচে নাই......এবার বৃদ্ধা আরও উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলো।

নূর হাতের পিঠে চোখ মুছলেন, বৃদ্ধার চোখের পানি তার হৃদয়কে বিচলিত করে ফেললো। নিজকে সংযত করে বললো নুর–মানুষ দুনিয়ায় কেউ বাঁচতে আসেনি বুড়ি মা দুঃখ করো না। কি হয়েছিলো তার?

বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছে বললো–ঠেলা গাড়িতে মাল বোঝাই ছিলো। সেই সময় একটা গাড়ি...মোটর গাড়ি আমার বেটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়......

বুঝতে পেরেছি আর বলতে হবে না বুড়ি মা।

তবু বুড়ি আরও বলে চললো– এই কাপড় আমার বেটা কিনে দিয়েছিলো তারপর এক বছর কেটে গেছে......আমার বেটা মরতো না একজন লোক আমাদের বস্তি এলাকায় এসে আমাদের অনেক অনেক টাকা পয়সা দিতো সে আর আসেনা তাই তো আমার বেটা ঠেলা চালাতে যেয়ে মরলো। ঐ বাবা যদি আসতো, তা হলে আমার মানিককে ঠেলা চালাতে হতো না। সে ব্যবসা করতো। আমার বেটা পড়া জানতে...

পাগলের মত বলে চললো সে।

জানিনা সে বাবা কোথায় গেছে। দেখছো না সে চলে যাবার পর কেউ আর আমাদের বস্তি এলাকার খবর নেয় না আমরা সবাই মরে যাবো।

না মরবে না। আমি তোমাদের টাকা কাপড় যা লাগবে সব দেবো। বললো নুর বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে।

দেবে তুমি আমাদের সবাইকে টাকা দেবে?

হাঁ যদি তার নাম বলেত পারে যে তোমাদের মধ্যে আসতো?

বুড়ি বললো–আমি তো নাম জানিনা তবে বলতে পারবো কেমন ছিলো সে।

আচ্ছা বলো তো? বললো নূর।

তখন চোখে আরও ভাল দেখতাম। সে যখন আসতো মনে হতো কোন মহামানব এসেছে। যেমন সুন্দর তার চেহারা তেমনি সুন্দর তার গলার আওয়াজ, তেমনি তার আচরণ। তাকে ভোলা যায় না।

সে বুঝি খুব ভালবাসতো তোমাদের সবাইকে?

হাঁ, আমরা গরিব যারা তারা সবাই তাকে ভালবাসতাম তাই সেও আমাদের ভালবাসতো। আমাদের দুঃখ দূর করার জন্য অনেক টাকা পয়সা সে বস্তি এলাকার মানুষদের দিয়েছে। জানিনা সে এখন কোথায়? কেন আর আসে না....

আবার বৃদ্ধার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

নূর বলে–তুমি বস্তি এলাকার মেয়ে হলেও বেশ সুন্দর কথা বলতে পারো।

আমি যে লেখাপড়া করেছিলাম। তাই তো আমার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলাম কিন্তু...

থাক, এবার সব বুঝলাম। এখন থেকে আমি আসবোতোমাদের দুঃখ ব্যথা যাতে দূর হয়। সেই চেষ্টা করবো। তোমাদের এই বস্তী এলাকায় একটা ইন্ডাষ্ট্রি করে দেবো যারা বেকার তারা সেখানে কাজ করে খাবে। তোমাদের বস্তী এলাকায় যদি কোন ইন্ডাষ্ট্রি করা যায় তা হলে এ সব বাড়ি ঘর দালান কোঠা হবে। পথে এতো কাদা থাকবে না। কেরোসিনের আলো জ্বালতে হবে না। ইলেকট্রিক–এ আলো জ্বলবে। তারপর আপন মনে বলে নূর আমরা যে অর্থ বিভিন্ন কারণে ব্যয় করি তা দিয়ে যদি শহরে–বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে, বস্তী এলাকায় ছোট খাটো ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি তা হলে দেশ ও দেশের জনগণের দুঃখ দূর হবে....

বৃদ্ধা চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই নূর বললো–বুড়িমা এই নাও কাপড়।

সত্যি তুমি কাপড় দেবে? মাগনা কাপড় দেবে বাপ?

হাঁ নাও। আরও যারা তোমার মত বৃদ্ধা অসহায় তাদেরকে ডেকে আনন, আমি সবাইকে কাপড় আর টাকা দেবো।

বৃদ্ধার দুচোখে খুশির জোয়ার। ছুটে যায় সে টলতে টলতে, যাকে সে সামনে পায় বলে ওরে আয় কাপড় আর টাকা যদি নিতে চাস আয়।

অল্প সময়ে বস্তীর সবাই এগিয়ে এলো।

ভীড় জমে গেলো নূরের চার পাশে।

কাপড় আর টাকা বিলিয়ে দিয়ে ফিরে এলো নূর। বাসায় না ফিরে সোজা সে চলে গেলো চৌধুরী বাড়িতে। এক পা কাদা আর সাধারণ জামা কাপড়ে ছুটে গেলো সে অন্তপুরে। দাড়ি গোফ খুলে জামার পকেটে রেখেছিলো তাই তাকে চিনতে কোন অসুবিধা হলো না।

আম্মি–আম্মি কোথায় তুমি আম্মি......

ছুটে এলো মনিরা পুত্রের গলা শুনতে পেয়ে, কিন্তু একি পরনে সাধারণ জামা–কাপড়। পায়ে এক হাঁটু কাদা…অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালো মনিরা।

নূর ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো– আম্মি কি আনন্দ…কি আনন্দ… তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না আমি…

মনিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, ছেলে কি তার পাগল হলো।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন।

তাদের চোখে মুখেও বিস্ময়।

[পরবর্তী বই বনহুর ও জলদস্যু]

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৩ মণিষা দ্বীপ

পরবর্তী:

৭.১৫ বনহুর ও জলদস্যু »